ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য—দেড়টাকা মাত্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন

"হিন্দু সমাজের ব্যাধি" এই নামে আমার কতকগুলি প্রবন্ধ গত এক বৎসর ধরিয়া "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলির সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" এই নামে গ্রন্থকারে প্রকাশ করিলাম। সাধারণ ভাবে হিন্দুসমাজের কথা বলিলেও, বাঙলার হিন্দুসমাজের কথাই প্রবন্ধগুলিতে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। বাঙালী হিন্দুর সম্মুখে আজ জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত। বাঙলার শিক্ষিত হিন্দুসমাজ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া এই গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে যদি সচেতন হন এবং আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কার্য্যালয়
৩০শে অক্টোবর,
১৯৪০

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

Of one thing, however, I feel sure, that no judgement will lead to lasting social gain which is reached by appeal to the emotions, which is based on inadequate knowledge of facts or which collect data with the view of supporting any preconceived opinion. —Karl Pearson

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বন্ধুবরেষু—

সে আজ ৩৬ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আমরা উভয়েই তখন বিবাগী তরুণ যুবক,—'ডন সোসাইটীর' সদস্য। বাঙলার নীরব কর্ম্মযোগী, সাধকশ্রেষ্ঠ আচার্য্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আচার্য্য সতীশচন্দ্র এই "ডন সোসাটীর" মধ্য দিয়াই স্বদেশী আন্দোলন তথা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। স্বদেশীযুগের উষার তিনিই আবাহন করেন। মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় 'সতীশবাবু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া সকলের আগে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন।' তরুণ বাঙলার মনে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতার উদ্বোধন করিবার জন্য আচার্য্য সতীশচন্দ্র যে অক্লান্ত সাধনা করিয়াছিলেন, আজ অনেকেই হয়ত তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সত্যকার সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। 'ডন সোসাইটীর' দেশসেবার পাঠশালায় যাঁহাদের হাতে খড়ি হইয়াছিল, আজ বাঙলার কর্ম্ম জীবনের নানা বিভাগে তাঁহাদের অনেককেই জাতিগঠনের ব্রত উদযাপন করিতে দেখিতেছি। আপনি তাঁহাদেরই প্রধান একজন। "ডন সোসাইটীর" নগণ্য সদস্যরূপে আমি যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম, এই গ্রন্থ তাহার ফলস্বরূপ সন্দেহ নাই। আপনি আজ দেশবিখ্যাত পণ্ডিত, আমি একজন অখ্যাত সাংবাদিক। তবু সেই অতীতের কথা মনে করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ আপনার হস্তে এই গ্রন্থ অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। ইতি—

ভবদীয়

১০ই নবেম্বর, ১৯৪০

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

সূচী-পত্র

পরিশিষ্ট

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

ভূমিকা

কাশীর ডাক্তার ভগবানদাস ভারতবিখ্যাত মনীষী। ভারতের বাহিরেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার খ্যাতি বিস্তৃত। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত বিবৃত করিয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা লইয়া কোন আলোচনা হয় নাই। ডাঃ ভগবানদাস হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে পত্রখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের মতে, হিন্দু সমাজের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তির এই পত্র পাঠ ও উহা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ডাঃ ভগবানদাস তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ভূয়োদর্শনের সাহায্যে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সমাধানের পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ডাঃ ভগবানদাস বলিতেছেন,—একতাই যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। হিন্দু সমাজের দৌর্ব্বল্য ও শক্তিহীনতার প্রধান কারণই একতার অভাব, ইহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি এবং প্রকাশ্যে সেই অভিমত প্রকাশও করিতেছি। কিন্তু what is the secret of achieving this unity?—এই একতা লাভের গুপ্ত রহস্য কি? যদি আমরা সেই রহস্যের সন্ধান করিতে পারি, তবে হিন্দু সমাজের অন্যান্য সমস্যার আপনা হইতেই সমাধান হইবে। কিন্তু একতালাভের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পাইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন—এই অনৈক্যের কারণ কি? কেননা, ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিতে না পারিলে উহার চিকিৎসা করা সম্ভবপর নহে। "বিশাল হিন্দু সম্প্রদায়" "সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু"—এই সব কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই সব কথার কোন অর্থ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন যে, ভারতে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাত্র কাগজে-কলমে নিবদ্ধ (Paper majority)। ইহার কারণ কি? ভারতের ২৭ কোটি হিন্দু যে প্রকৃতপক্ষে একটা সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায় নহে, তাহার মূল রহস্য কোথায়? হিন্দুজাতি এবং হিন্দুত্বকে রক্ষা করিবার জন্য আজ কেন আমরা চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছি? দ্বিতীয়তঃ, ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা একশত হইতে শতকরা ৬৫তে কেন নামিয়া আসিয়াছে? বাঙলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা যে শতকরা ৪৫-এ দাঁড়াইয়াছে, তাহারই বা কারণ কি? ইহার জন্য কি অন্যেরা দায়ী? না, হিন্দুদের নিজের দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে? হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিভেদের অত্যাচার, হিন্দুদের স্বধর্ম্মচ্যুতি, কুসংস্কারের প্রাবল্য—এই সবের মূলে কি তাহাদের অধঃপতনের কারণ নিহিত নাই? যদি আমরা এই দুর্গতি ও অধঃপতনের মূল কারণ নির্ণয়

করিতে না পারি, তবে সভা, সমিতি, সম্মিলন প্রভৃতি করিয়া কোনই ফল হইবে না।

ডাঃ ভগবানদাস বলিয়াছেন, আমি বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, হিন্দুধর্ম্মের * বিকৃতিই হিন্দুদের বর্ত্তমান দুর্গতির মূল। এই বিকৃতির জন্যই হিন্দুসমাজ আজ আর একটি সঙ্ঘবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নহে,—বহু বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমষ্টি মাত্র। গত আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুসারে এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির সংখ্যা দুই হাজার হইতে তিন হাজার পর্য্যন্ত হইবে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই পরস্পরের "অস্পৃশ্য", পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন, এমন কি অনেক স্থলে পরস্পরের পরিপন্থী। জাতি, উপজাতি, শাখাজাতি এইভাবে হিন্দু-সমাজ ক্রমাগত বিভক্ত, খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতির ফলেই ৭।৮ কোটি লোক অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য, তাহারা হিন্দুসমাজের মধ্যে নামে মাত্র আছে। আরও ৭।৮ কোটি লোক হিন্দুসমাজ হইতে বাহির হইয়া গিয়া মুসলমান হইয়াছে এবং কয়েক কোটি খৃষ্টান হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহার মধ্যে কিছুমাত্র কল্পনা নাই, সমস্তই নিষ্ঠুর সত্য। যাঁহারা হিন্দুসমাজের দুর্গতির কথা চিন্তা করিতেছেন, তজ্জন্য উদ্বেগ বোধ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ডাঃ ভগবান দাস জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কেন এমন হইল? যদি ইহা হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতির ফল না হয়, তবে উহার অন্য কি কারণ হইতে পারে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,—তৃতীয়পক্ষের প্ররোচনা ও প্রচারের ফলেই এরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই যদি ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা

* ডাঃ দাস—'হিন্দুধর্ম্ম' বলিতে এখানে হিন্দুর সমাজব্যবস্থা বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বুঝাইয়াছেন।

না থাকিবে, তবে তৃতীয়পক্ষ তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে কেন? সুতরাং তৃতীয় পক্ষের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। নিজেদের সমাজদেহেই যে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—অন্যথা আসন্ন ধ্বংস হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই।

ডাঃ ভগবানদাস লিখিয়াছেন,—"আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—হিন্দুসমাজের এই অনৈক্য, বিশৃঙ্খলতা এবং সঙ্ঘশক্তিহীনতার কারণ কি, তাহা হইলে আমি দ্বিধাহীনচিত্তে উত্তর দিব—প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া জাতিভেদে পরিণত করাই ইহার কারণ।" প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগ বা জীবিকাবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; যে যে-কার্য্যের যোগ্য, তাহাকে সেই কার্য্যের অধিকার দেওয়া হইত। উহা সব সময়ে বংশানুক্রমিক হইত না, অন্ততপক্ষে সেরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কিন্তু উহাই কালক্রমে বিকৃত হইয়া 'জাতিভেদে' পরিণত হইল, কর্ম্ম বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইল, স্বাভাবিক যোগ্যতা বা গুণের আর কোন মর্য্যাদা রহিল না। কোন ব্রাহ্মণ-বংশজাত যতই মূর্খ হউক না কেন, বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ, পৌরহিত্যের অধিকার সে পাইবে-ই। ক্ষত্রিয়ের পুত্র কাপুরুষ ও দুর্ব্বল হইলেও যুদ্ধই হইবে তাহার কৌলিক বৃত্তি, বাণিজ্য-বুদ্ধি না থাকিলেও বৈশ্যপুত্রকেই করিতে হইবে শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ। এইভাবে—(১) বিভিন্ন বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বংশানুক্রমিক প্রথার মধ্য দিয়া বহু 'স্বতন্ত্র জাতি'র সৃষ্টি হইল। বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজে এই সব স্বতন্ত্র জাতির সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। (২) এই সব জাতি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন। (৩) প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্বতন্ত্র স্বার্থবোধের সৃষ্টি হইল, আর তথাকথিত উচ্চ জাতিরা সেই সুযোগে যতদূর সম্ভব সুখ-সুবিধা, অধিকার নিজেরাই

হস্তগত করিলেন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ ত্যাগ করিলেন। (৪) ঐশ্বর্য্য, শাসনক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব, এমন কি, বিদ্যা পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় কতকগুলি বংশের মধ্যে নিবদ্ধ হইল। (৫) এই সব সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে যোগ্য লোকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল এবং অযোগ্যের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, কেন না যোগ্যতালাভের জন্য তাহাদের কোন প্রয়োজন বা উৎসাহ ছিল না, অযোগ্যতার জন্যও তাহাদিগকে কোন শাস্তিভোগ করিতে হইত না। (৬) ইহার ফলে সমাজে ক্রমেই অযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং সমষ্টিগতভাবে সমাজজীবন অধিকতর বিশৃঙ্খল ও সঙ্ঘ-শক্তিহীন হইতে লাগিল। (৭) দম্ভ, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, লোভ, বিদ্বেষ, কাপুরুষতা প্রভৃতি পাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। (৮) তথাকথিত উচ্চ জাতিরা তথাকথিত নিম্ন জাতিদিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, অবনত এবং বাধ্য রাখিবার জন্য তাহাদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সৃষ্টির সহায়তা করিতে লাগিল। (৯) সাধারণভাবে ভারতবাসী এবং বিশেষভাবে হিন্দুরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং বিদেশীরা আসিয়া ভেদনীতির সাহায্যে সহজেই তাহা-দিগকে পদানত করিতে পারিল। (১০) বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজ তথা সাধারণভাবে ভারতবাসীদের মধ্যে যে অসন্তোষ, অশান্তি, বিদ্রোহভাব, পরস্পরের সঙ্গে সজ্ঘর্ষ এবং বিপর্য্যয়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—ইহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনাসমূহেরই শেষ পরিণতি।

নিজেদের যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, যতদিন তাহারা নিজেদের এই সব দোষ বা অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে এবং উহার প্রতিকারে সঙ্কল্পবদ্ধ না হইবে, ততদিন হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়াই থাকিবে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জাতিভেদ

ডাঃ ভগবান দাসের মতে জাতিভেদই হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্গতির মূল কারণ। যাহা পূর্ব্বে সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" ছিল, তাহাই কালক্রমে বিকৃত হইয়া এই ঘোর অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং আরও কোন কোন মনীষীও এই রূপ কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন। কথাটা অনেকটা সত্য হইলেও, আমাদের মনে হয়, ইহার সবখানি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে বর্ণাশ্রম বা কর্ম্মবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ যে একেবারেই ছিল না এমন কথা বলা যায় না। জাতিভেদের আরম্ভ হইয়াছিল সেই কালে, যে কালে দ্বিজাতি ও শূদ্র এই দুই বৃহৎ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল। দ্বিজাতি বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝাইত। ইহারা সকলেই ছিলেন আর্য্য। এই তিন বর্ণের মধ্যে আহার ব্যবহারে, বিবাহের আদান-প্রদানে বিশেষ কোন ভেদ ছিল না। ইহার পরেই একটা দুর্ল্লঙ্ঘ্য গণ্ডী টানিয়া দেওয়া হইয়াছিল—আর সেই গণ্ডীর অপর পারে ছিল শূদ্রেরা। শূদ্র বলিতে 'অনার্য্যদের' বুঝাইত। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া আদিম অধিবাসী অনার্য্যদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কতকাংশকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। যে সব অনার্য্য আর্য্যদের শরণাপন্ন হইল, তাঁহাদের দাস বা অনুগত হইয়া বাস করিতে সম্মত হইল, তাহারাই আখ্যা পাইল শূদ্র (মূল শব্দ 'ক্ষুদ্র')। তাহারা আর্য্যদের পরিচর্য্যা করিয়া তাহাদের সমাজের আওতায় কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে লাগিল ('পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম

শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং')। কিন্তু শুধু পরিচর্য্যার অধিকারটুকুই তাহারা পাইল,—আর্য্যেরা তাহাদের সঙ্গে আহার-ব্যবহার মেলা-মেশা করিতেন না, বৈবাহিক আদান-প্রদান তো দূরের কথা। 'অস্পৃশ্যতা' ও 'অনাচরণীয়তার' সূচনা হইল এইখানেই।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। শূদ্রদের মধ্যেও আবার একটা গণ্ডী টানা হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত হীন, অধম বা বর্ব্বর বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহারা হইল 'অন্ত্যজ'। ইহারা আর্য্যদের অধ্যুষিত গ্রামে বা নগরে থাকিতে পারিত না, উহার বাহিরে প্রান্তসীমায় থাকিতে বাধ্য হইত। শূদ্রেরা চতুর্থবর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আর এই অন্ত্যজদের বলা হইত 'পঞ্চমবর্ণ'। ভারতের সকল প্রদেশেই এই পঞ্চমবর্ণের অস্তিত্ব এককালে ছিল। এখনও দক্ষিণ ভারতে বিশেষত মাদ্রাজে তাহার জীবন্ত নিদর্শন বিদ্যমান। এই পঞ্চমবর্ণীয়েরা এমনই 'হীন ও অধম' যে, তাহারা গ্রাম বা সহরের এলাকার বাহিরে বাস করিতে বাধ্য হয়, রাজপথ দিয়া হাঁটিতে পারে না। সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপ হইতে জল তুলিতে পারে না। ব্রাহ্মণ দেখিলে পলায়ন করে, পাছে তাহাদের গায়ের বাতাস লাগিয়া ব্রাহ্মণ অশুচি হয়। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও অন্ত্যজদের বংশীয়েরা আছে, কিন্তু তাহাদের এতটা সামাজিক নির্য্যাতন বা দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয় না।

এই যে দ্বিজাতি, শূদ্র এবং অন্ত্যজ—ইহাই হিন্দুসমাজে প্রথম জাতিভেদ। আর্য্যেরা অবশ্য নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধি তথা সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার ফলে যে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে বর্দ্ধিত ও শাখা-প্রশাখা সমন্বিত হইয়া সহস্রশীর্ষ জাতিভেদরূপে প্রকট হইল।

হিন্দু সমাজে যে 'অস্পৃশ্যতারূপ' ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারও ভিত্তি পূর্ব্বোক্ত আর্য্য-অনার্য্য ভেদের উপর। দ্বিজাতিরা শূদ্র ও

অন্ত্যজদের স্পর্শ করিতেন না, করিলে 'ধর্ম্মহানি' হইত, তাহাদের প্রস্তুত বা পৃষ্ট আহার্য্য-পানীয় গ্রহণ করা তো দূরের কথা। কালক্রমে পরিচর্য্যার গুণে শূদ্রদের মধ্যে কেহ কেহ দ্বিজাতিদের স্পৃশ্য ও আচরণীয় হইল বটে, কিন্তু অনেকে পূর্ব্ববৎ অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়ই রহিয়া গেল। অন্ত্যজদের তো কাহারও ভাগ্যের উন্নতি হইলই না। বাঙ্গলা দেশের হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় উভয়ই আছে। কতকগুলি জাতি 'অনাচরণীয়' (যাহাদের জল 'চল' নহে) কিন্তু অস্পৃশ্য নহে,—অপর কতকগুলি উভয়ই।

সুতরাং ডাক্তার ভগবান দাস যে বলিয়াছেন, প্রাচীনকালে হিন্দু-সমাজে বর্ণাশ্রম ছিল, জাতিভেদ ছিল না, তাহার মধ্যে এইটুকু সত্য যে, আর্য্য 'দ্বিজাতিদের' মধ্যে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) জাতিভেদ ছিল না,—আহার-ব্যবহার, বৈবাহিক আদান-প্রদান তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চলিত। একের বংশধরেরা অন্যের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত। কিন্তু এরূপ "বিশুদ্ধ" বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা খুব বেশীদিন অব্যাহত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতের যুগেও দেখি,—দ্বিজাতিদের মধ্যে বৃত্তি অনেকটা বংশানুক্রমিক হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ বর্ণাশ্রম জাতি-ভেদের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বংশধরেরা ব্রাহ্মণের বৃত্তিই অবলম্বন করিত, কেহ কদাচিৎ ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিত। আবার ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও কেহ কদাচিৎ ব্রাহ্মণ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণেরা "ক্ষত্রিয়" বলিয়া গণ্য হইতেন না, ব্রাহ্মণই থাকিয়া যাইতেন। যথা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি। পরশুরামের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বৈশ্য অধিরথ-পুত্র কর্ণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিলেও ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হন নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন

বর্ণের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান চলিত বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত অল্প। এই সমস্ত হইতে বুঝা যায়, মহাভারতের যুগেই দ্বিজাতিদের মধ্যে জাতিভেদ বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল এবং অনেকটা পাকাপাকি-ভাবেই 'বৃত্তি' বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপার ঘটিল—যাহাতে জাতিভেদের কাঠামো আরও বেশী দৃঢ়তর হইল। আর্য্যসমাজের প্রথমাবস্থায় দ্বিজাতিদের মধ্যে উচ্চনীচ-ভেদ বিশেষ ছিল না, সকলেরই মর্য্যাদা সমান ছিল। কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে ব্রাহ্মণদের মর্য্যাদা খুব বাড়িয়া গেল, তাঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা ব্রাহ্মণের পরে এবং বৈশ্যের মর্য্যাদা ক্ষত্রিয়ের পরে নির্দ্দিষ্ট হইল। ফলে, পরস্পরের মধ্যে আহারব্যবহার, বৈবাহিক আদানপ্রদান ক্রমশ লুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ের চেয়ে বেশী মানী হন, তাঁহার বাড়ীতে অন্নগ্রহণ না করেন, তবে তিনি ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে বিবাহ করিবেন কিরূপে? ক্ষত্রিয়ই বা ব্রাহ্মণকন্যার পাণি-পীড়নের সাহস সঞ্চয় করিবেন কিরূপে? মহাভারতে যে সমাজের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে এই সব প্রথা তখনই যে অনেকটা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এইভাবে দ্বিজাতিদের মধ্যে জাতিভেদ যখন বেশ পাকারকম হইয়া দাঁড়াইল, তখন আর একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইল। বর্ণবিভাগকে গণ্ডী টানিয়া জাতিভেদে পরিণত করা যায়, কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করা যায় না। সেক্ষেত্রে জীবপ্রকৃতি মানুষের সকল বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজশাসনের অনভি-প্রেত কাণ্ড করিয়া বসে। সুতরাং বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বৈবাহিক মিলন ঘটিতে লাগিল।

ফলে, বিভিন্ন মিশ্র জাতি বা সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে অনার্য্য শূদ্রেরাও বাদ গেল না—তাহাদের যুবকযুবতীদের সঙ্গেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈবাহিক মিলন ঘটিতে লাগিল। কালক্রমে এই যে সব সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইল, তাহাদিগকে সমাজের কোথায় স্থান দেওয়া হইবে, ইহা এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এই সমস্যার বিপুলতা ও জটিলতার প্রমাণ 'মনুসংহিতা' হইতে পাওয়া যায়। সঙ্করজাতির সৃষ্টি অবশ্য মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না, বরং অত্যন্ত নিন্দনীয়ই ছিল। 'গীতায়' অর্জ্জুন বলিয়াছেন, 'সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ'। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "বর্ণসঙ্কর"দের কিছুতেই অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করা গেল না, সমাজে তাহাদিগকে স্থান দিতেই হইল; চারিবর্ণ বা চারিজাতি ভাঙ্গিয়া বহুবর্ণ বহুজাতিতে পরিণত হইল। এইরূপে জাতিভেদ বেশ জাঁকালো রকমে বহু বিচিত্র মূর্ত্তিতে হিন্দুসমাজে তাহার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিল।

জাতিভেদের পরিণাম

এই জাতিভেদের আবির্ভাবের ফলে ভারতের হিন্দুসমাজের দেহ যে বহুল পরিমাণে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আর্য্যেরা প্রথমত বিজিত ও অনুন্নত অনার্য্যদিগকে শূদ্ররূপে সমাজদেহে স্থান দিয়া একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু বর্ণভেদ এবং উহার অনিষ্টকর পরিণাম জাতিভেদের জন্য তাঁহাদের সেই মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল,—হিন্দুসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী

হওয়া দূরে থাকুক, উহার মধ্যে নানাবিধ ভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হইল। জাতিভেদের এই অনিষ্টকর পরিণামকে প্রতিরোধ করিবার প্রবল চেষ্টা হয় জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষ হইতে। এই দুই ধর্ম্মের মূল নীতিই সাম্য ও মৈত্রী। জাতিভেদের বিরুদ্ধে, বিশেষ-ভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে উভয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে এই কার্য্যসাধন করে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৫ শতক হইতে খৃষ্টাব্দ প্রায় ৭ শতক পর্য্যন্ত প্রায় ১২০০ শত বৎসরকাল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল;—ঐ প্লাবনে হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, জাতিভেদের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম আরও নানাভাবে হিন্দুসমাজ তথা ভারতের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সমস্ত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সনাতন ধর্ম্ম বা 'সদ্ধর্ম্ম' বৌদ্ধ ধর্ম্মের তুলনায় তখন ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, দ্বিজাতি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব প্রতাপ ও প্রভুত্ব আর ছিল না, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একটা সাম্যের আদর্শও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্তু খৃষ্টাব্দ ৮ শতক হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইতে থাকে এবং হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান বা নব অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। ইহার কারণ একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন এবং বৌদ্ধসঙ্ঘের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি,—অন্যদিকে হিন্দুসমাজে শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অশেষ প্রতিভাশালী ধর্ম্মাচার্য্যগণের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনোন্মুখ সৌধে ইঁহারা যে প্রবল আঘাত করিতে লাগিলেন, উহা প্রতিহত করিবার শক্তি ঐ জরাজীর্ণ ধর্ম্ম ও সমাজের ছিল না।

অবশ্য এই কার্য্য ২।৪ বৎসরে হয় নাই, উহা সম্পন্ন করিতে কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধীরমস্তিষ্ক ব্রাহ্মণ মনীষী ও ধর্ম্মাচার্য্যেরা অপূর্ব্ব কৌশলে বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ দেবদেবীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত করা হইল; বৌদ্ধমন্দির হিন্দুমন্দিরের মধ্যে আত্মগোপন করিল; বৌদ্ধ আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতি নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া হিন্দু পূজা-পার্ব্বণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে মিশিয়া গেল। এমন কি হিন্দু দার্শনিকেরা বৌদ্ধ দর্শন ও মতবাদ পর্য্যন্ত বেমালুম হজম করিয়া ফেলিলেন।

বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সময় লাগিয়াছিল। কেননা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এত বেশী আধিপত্য বিস্তার করে নাই। খৃষ্টিয় নবম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্মের নবজাগরণ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হইয়াছিল, কিন্তু বাঙলাদেশে দ্বাদশ শতাব্দীরও কিয়দংশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশের সনাতনপন্থী হিন্দুরা বৌদ্ধাচারপ্লাবিত বাঙলাদেশকে রীতিমত অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। বাঙলাদেশের একাধিক হিন্দুরাজা বৈদিক যজ্ঞহোমাদি অনুষ্ঠান করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, কেননা বাঙলাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন না;—এইরূপ জনশ্রুতি ইতিহাসের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। বাঙলাদেশের তখনকার অবস্থা বিবেচনা করিলে এই জনশ্রুতি অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বাঙলাদেশের পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। সেন রাজগণের সময়েই প্রথম হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয় এবং যতদূর জানা যায়, রাজা বল্লাল সেনের সময়েই হিন্দু ধর্ম্মের পূর্ব্ব গৌরব আবার বহুল পরিমাণে

ফিরিয়া আসে। রাজা বল্লাল সেন নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলীও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাতেও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বল্লাল সেন তাঁহাদের সহযোগিতায় হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন করেন এবং নূতন করিয়া জাতিভেদের পত্তন করেন। আমরা বলিয়াছি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্মের পুন-প্রতিষ্ঠা তাহার দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বেই হইয়াছিল। *

কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, কি বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধাচারের অবসানের ফলে প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে জাতিভেদ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রবলাকার ধারণ করিল। বৃত্তিভেদ অনুসারে নানা নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হইল, উচ্চ-নীচ ভেদ আরও আত্যন্তিক হইল। প্রাচীন বর্ণাশ্রমের ধারা বহুপূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তাহার স্থানে হিন্দুসমাজে দেখা দিল অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন জাতি উপজাতি শাখাজাতি। রাজা বল্লাল সেন বাঙলাদেশে যখন নূতন করিয়া হিন্দুসমাজ বন্ধন করিলেন, তখন তিনি নাকি ছত্রিশটি জাতিতে সমাজকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল,— ভাগ-উপভাগ, শাখা-প্রশাখা ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

বল্লাল সেনের কয়েক শতাব্দী পরে ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে নূতন করিয়া আবার সমাজবন্ধন করিলেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। তখন বোধ হয় ছত্রিশ জাতিতে কুলাইতেছিল না, উহার সংখ্যা কমপক্ষে ২৩৬-এ গিয়া পৌছিয়াছিল। বর্ত্তমানে ডাঃ ভগবান দাসের হিসাবে হিন্দুসমাজের

---

* প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীতেও বাঙলাদেশে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মই উহাকে পরিশেষে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। উড়িষ্যাতেও ঐরূপ ঘটে।

দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুসমাজে ইহার বিপরীত লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি। এ সমাজে বিকর্ষণী শক্তিই প্রবল, ইহা সকলকে এক সাম্যের সূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, পৃথক্ করিয়া দিবার জন্যই যেন ব্যস্ত। পুরুভূজের দেহের মত হিন্দুসমাজ নিজেকে কেবলই ভাগ করিতেছে এবং সেই সব পৃথক পৃথক ভাগ হইতে এক একটা স্বতন্ত্র উপসমাজের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাদের কাহারও সঙ্গে কাহারও যেন যোগ নাই। অন্য একটা উপমা দিয়া বলিতে পারা যায়, হিন্দুসমাজ যেন একটা ভাসমান দ্বীপপুঞ্জ ;—অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ইহার মধ্যে আছে, কিন্তু তাহাদের কাহারও সঙ্গে কাহারও ঘনিষ্ঠ বন্ধন নাই। অনেক সময় ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয়, এতকাল ধরিয়া বিকর্ষণীশক্তিপ্রধান এই সমাজ কিরূপে টিকিয়া আছে! কিন্তু এই জরাজীর্ণ প্রাচীন সমাজের চারিদিকে যেমন ফাটল ধরিয়াছে, বৈষম্যনীতি যেমন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ মনে হয় না। অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তথাকথিত "নিম্নজাতিরাও" পরস্পরকে হীন ও ক্ষুদ্র মনে করে এবং একে অন্যকে "অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়" বলিয়া ঘৃণা করে। "শুদ্ধি ও সংগঠন" আন্দোলন যাঁহারা পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আছে। একজন সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ হয়ত মুচি, মেথর বা ডোমের হাতে জল খাইবে, কিন্তু মুচি, মেথর বা ডোম কেহই পরস্পরের হাতের জল খাইবে না, এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করা তো দূরের কথা। এজন্য দায়ী তাহারা নহে—দায়ী উচ্চ জাতীয়েরাই। উচ্চ জাতীয়েরা যে বৈষম্যের মন্ত্র নিম্ন জাতিদের কানে দিয়াছে, এ তাহারই পরিণাম। চেলারা এখন গুরুদের ছাড়াইয়া গিয়াছে। আজ যে বৃটিশ শাসকেরা নিম্ন জাতিদের লইয়া একটা কৃত্রিম তপশীলী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন এবং এই

'তপশীলীরা' নিজেদের সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ বলিয়া ভাবিতে শিখিতেছে এবং তদনুসারে কার্য্যও করিতেছে,—এ-ও উচ্চ জাতীয়দের বৈষম্যনীতিরূপ পাপের ফল।

বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে কেবল যে অসংখ্য জাতি, উপজাতি, শাখাজাতি প্রভৃতিরই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নহে; হিন্দুসমাজে বহুলোক নানাভাবে হীন, পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ও সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের ফলে বহু বৌদ্ধ সনাতন হিন্দুসমাজের মধ্যে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু যাহারা ফিরিয়া আসিল না, তাহারা হীন ও পতিত বলিয়া গণ্য হইল। এমন কি ২।৩ পুরুষ পরে উহাদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ফিরিয়া আসিল, তাহাদেরও পাতিত্য-দোষ সম্পূর্ণ ঘুচিল না; সমাজের নিম্নস্তরে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় হইয়াই তাহারা রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙলাদেশে হিন্দু ধর্ম্মের নব অভ্যুদয় একটু বিলম্বে হইয়াছিল। রাজা বল্লাল সেনের পরেও ২।৩ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহুলোক বৌদ্ধাচার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুসমাজের মধ্যে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমাজে তাহারা উচ্চস্থান পায় নাই। এই জাতিভেদপ্রপীড়িত দেশে ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করাও সব সময়ে নিরাপদ নয়, লোকের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা আছে। তৎসত্ত্বেও দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব। যে 'ডোম' জাতি এখন অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য, তাহারা এককালে বৌদ্ধ ছিল—তাহাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধাচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্যও করিত। সেদিন পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা প্রধানত এই 'ডোম' পুরোহিতেরাই করিয়াছে। 'যোগী' সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা যে বৌদ্ধ

ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। ইতিহাস পাঠকেরা জানেন, সুবর্ণবণিকদের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ বল্লাল সেনের পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিল। সেইজন্যই পরবর্ত্তী কালে হিন্দুসমাজে তাহারা তাহাদের প্রাপ্য উচ্চস্থান পায় নাই। অথচ সুবর্ণবণিকেরা হিন্দুসমাজের কোন তথাকথিত উচ্চজাতির চেয়েই কোন দিক দিয়া নিকৃষ্ট নহে।

নবজাগ্রত হিন্দুসমাজ বৌদ্ধ ও বৌদ্ধাচারসম্পন্নদিগকে কেবল যে হীন ও পতিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা নহে, তাহাদের উপর বহু নির্য্যাতন ও অত্যাচারও করিয়াছিল। ফলে অনেকে দেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে পলাইয়াছিল, যাহারা ছিল তাহারা হিন্দু সমাজে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল অথবা আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং ইসলাম ধর্ম্ম তাহার সাম্যের বাণী লইয়া যখন এদেশে দেখা দিল, তখন এই সব নির্য্যাতিত বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধাচারীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ইসলাম বিজেতা শাসকদের ধর্ম্ম হওয়াতে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কার্য্য আরও সহজ হইল। প্রলোভনের অভাব ছিল না। বাঙলা দেশে নিম্ন জাতীয়দের মধ্যেই বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী ছিল এবং ইহারাই বেশীর ভাগ মুসলমান হইল।

ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজ ইসলাম ধর্ম্মের এই প্রবল আক্রমণ রোধ করিবার জন্য ভ্রান্তপথে অগ্রসর হইল। অধিকতর সাম্যভাব বা উদারতর নীতি অবলম্বন করা দূরে থাকুক, হিন্দুসমাজ নিজের চারিদিকে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিল; জাতিভেদের কঠোরতা আরও বর্দ্ধিত হইল, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা আরও বেশী প্রবল হইল। ইহার ফলে কোনরূপ "যবন সংস্পর্শ" ঘটিলেই তাহা পাতিত্যের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে" রূপসনাতন ও সুবুদ্ধি রায়ের যে কাহিনী আছে,

তাহা হইতে এই "যবন সংস্পর্শজনিত" পাতিত্য দোষের স্বরূপ বেশ বুঝা যায়। রূপ সনাতন দুই ভ্রাতা গৌড়ের বাদশাহের প্রধান অমাত্য ছিলেন। অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে রাজকার্য্য ব্যপদেশে বাদশাহের ভবনেই থাকিতে হইত, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশাও করিতে হইত। সম্ভবত "আহার্য্য দোষও" কিছু ঘটিয়া থাকিবে। তাঁহারা ছিলেন মূলত কানাড়ী ব্রাহ্মণ—তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করাতে তাঁহারা বাঙালী ব্রাহ্মণসমাজেই মিশিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ের বাদশাহের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসাতে ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে "পতিত" বলিয়া গণ্য করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় ইঁহারা উভয়েই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হন এবং বৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারা বাদশাহের মন্ত্রীরূপে কেবল যে রাজকার্য্যে বিচক্ষণ ছিলেন তাহা নহে, সর্ব্বশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিতও ছিলেন। তাঁহারা যে সব বৈষ্ণব দর্শনের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় সুপ্রকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারে তাঁহারাই যে অগ্রণী, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এই দুই ভ্রাতাকেই তদানীন্তন ব্রাহ্মণসমাজ 'পতিত' বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।

সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্ব্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন, পরে স্বীয় মুসলমান মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্যচ্যুত হন। এই মুসলমান মন্ত্রীই পরে বাদশাহ হন এবং তাঁহারই ছলনাতে একবার সুবুদ্ধি রায় কোন "অখাদ্য" দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অনিচ্ছাকৃত মহা অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন, তাঁহাকে "তূষানল প্রায়শ্চিত্ত" করিতে হইবে। অর্থাৎ তূষের আগুনে ধীরে ধীরে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় অবশেষে

তিনি এই আত্মহত্যার দায় হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং একজন ঈশ্বরভক্ত পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠেন।

বাঙলাদেশে "পীরালি" ব্রাহ্মণদের ইতিহাসও ঠিক এই শ্রেণীর ঘটনার সহিত সংস্পৃষ্ট। এই "পীরালি" ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে কোনরূপ "যবন সংস্পর্শ" দোষেই যে তাঁহারা "পীরালিত্ব" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সমস্ত কাহিনীতেই এইরূপ কথা আছে। সম্ভবত এই "পীরালিদের" পূর্ব্বপুরুষ রূপ-সনাতনের মতই কোন মুসলমান নবাব বা বাদশাহের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন অথবা সুবুদ্ধি রায়ের মত "অখাদ্যের" ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন একজন মুসলমান পীরের ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যে কারণই সত্য হউক, কোনরূপ "যবন সংস্পর্শ"ই যে ইঁহাদের পাতিত্যের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই "অপরাধে"র জন্য পুরুষপরম্পরাক্রমে ইহাঁরা হিন্দুসমাজে কোণঠাসা হইয়া আছেন। আধুনিককালে যদিও "পীরালি" ঠাকুর বংশের বংশধরগণ নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভায় বাঙালী হিন্দুসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তবুও তাঁহাদের সেই "মালিন্য" তিরোহিত হয় নাই। হিন্দুসমাজের এই আত্মহত্যাকর নীতির দ্বারা তাহার যে কি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

পাতিত্য দোষ—২

'পীরালি' ব্রাহ্মণেরা কোণঠাসা হইয়াও তবু হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে, যাহারা "যবনস্পর্শ দোষে" অভিশাপগ্রস্ত হইয়া, না-হিন্দু-না-মুসলমান—এইরূপ একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছে। মালকানা রাজপুতদের কথা শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের সময় অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহারা নামে মাত্র মুসলমান হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা 'পতিত' হিন্দু। আচার ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকারে তাহারা হিন্দুই আছে, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলনের সময় ইহারা হিন্দু হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং শুদ্ধি আন্দোলনের পরিচালক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চেষ্টায় বহু মালকানা রাজপুত হিন্দুসমাজে গৃহীতও হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে গৃহীত হয় নাই, এমন সব মালকানা রাজপুত এখনও আছে এবং তাহারা পূর্ব্ববৎ "ত্রিশঙ্কু" অবস্থার মধ্যেই বাস করিতেছে। বাঙলাদেশে 'পটুয়া' (চিত্রকর) নামে একটিশ্রেণী আছে, যাহাদের অবস্থা অনেকটা মালকানা রাজপুতদের মতই। ইহারা কবে 'মুসলমান হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে অনুমান ৩০০।৪০০ বৎসরের পূর্ব্বে নয়। কিন্তু ইহাদের আচার-ব্যবহার অনেক বিষয়েই হিন্দুদের মতই, বিবাহ পর্য্যন্ত অনেকটা হিন্দু প্রথাতেই হয়। কিন্তু তবুও হিন্দু সমাজ হইতে ইহারা বহিষ্কৃত। অথচ নামে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও মুসলমান সমাজেও ইহারা সম্পূর্ণরূপে স্থান পায় নাই। আমাদের মনে হয়, কোনরূপ "যবন সংস্পর্শ" দোষে এক সময় এই বৃহৎ শ্রেণীকে হিন্দু

সমাজপতিরা পাইকারী ব্যবস্থায়—'পতিত' ও সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই—ইহারা 'না ঘাটকা না ঘরকা' অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। আমরা যতদূর জানি, শুদ্ধি আন্দোলনের সময় ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পরিবার হিন্দু হইয়াছিল। কিন্তু এখনও অনেকে পূর্ব্ব অবস্থাতেই আছে।

'মগো কায়েত', 'মগো বামুন' প্রভৃতির নাম আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই হয়ত শুনেন নাই। শুনিলেও ইহার অর্থ বুঝা অবস্থাভিজ্ঞ ভিন্ন সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। বাঙলার ইতিহাস পাঠকেরা জানেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মগ দস্যুরা বাঙলার সমুদ্রকূলবর্ত্তী পূর্ব্বাঞ্চলে প্রায়ই অত্যাচার ও লুণ্ঠন করিত। তাহারা সমুদ্রপথে বড় বড় নৌকা বা দেশী জাহাজে করিয়া আসিত এবং হঠাৎ দল বাঁধিয়া নামিয়া গ্রাম আক্রমণ করিত। তখনকার দিনে বাঙলার গ্রামবাসীরা এমন নিবীর্য্য হয় নাই। সুতরাং তাহারাও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মগ দস্যুদের প্রতিরোধ করিত। যুদ্ধে কখনও কখনও মগ দস্যুরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিত, কখনও বা তাহারা জয়লাভ করিয়া গ্রামবাসীদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করিত। কেবলই যে টাকাকড়ি, মূল্যবান দ্রব্যাদিই মগেরা লইয়া যাইত তাহা নহে, সময়ে সময়ে নারীহরণও করিত। যাহাদের স্ত্রী-কন্যাদি মগ দস্যুরা হরণ করিয়া লইয়া যাইত, তাহাদের একেই লজ্জা ও কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিত না, তাহার উপর গ্রামের সকলে মিলিয়া ঐ "অপরাধে" তাহাদের জাতিচ্যুত বা পতিত বলিয়া গণ্য করিত। ঐ সব পতিত গৃহস্থদিগকেই 'মগো বামুন', 'মগো কায়েত', 'মগো বৈদ্য', 'মগো নাপিত' প্রভৃতি বলা হইত। অর্থাৎ ঐ সব হতভাগ্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতির গৃহ হইতে মগ দস্যুরা যে জোর করিয়া নারীহরণ করিয়া লইয়া যাইত, সমাজ তাহার জন্য হীনতার ছাপ চিরদিনের জন্য ঐ হতভাগ্যদেরই কপালে দাগিয়া দিবার ব্যবস্থা করিত

সে কলঙ্কের চিহ্ন এখনও তাহাদের বংশধরেরা বহন করিতেছে। যশোর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় কোন কোন অঞ্চলে বহু 'মগো বামুন', 'মগো কায়েত', 'মগো বৈদ্য', 'মগো নাপিত' প্রভৃতি আছে। ভাল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ইহাদের হাতে জল খায় না, কোনরূপ আহার ব্যবহার করে না। 'মগো'রা নিজেদের মধ্যেই আহারব্যবহার করে, পুত্রকন্যার বিবাহ দেয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যশোরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। যশোর বার লাইব্রেরীর জনৈক উকীল জাতিতে "মগো কায়স্থ" ছিলেন। তাঁহার জন্য পৃথক জলখাবারের স্থান ছিল। একদিন তিনি ভ্রমক্রমে বা অন্য কোন কারণবশত উচ্চজাতিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট জলখাবারের ঘরে প্রবেশ করিয়া জলপান করেন। জনৈক উচ্চ জাতীয় উকীল এই অনাচার দেখিতে পাইয়া "মগো কায়স্থ" উকীলকে তিরস্কার করেন। ফলে উভয়ে বচসা হয়, এমন কি মারপিটও হয়। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। সেই সময়ের সংবাদপত্রে ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

হিন্দুসমাজ নূতন নূতন "জাতি" সৃষ্টি করিয়া এবং নানা বিচিত্র ও অদ্ভুত কারণে কতকগুলি শ্রেণীকে 'হীন' ও 'পতিত' ঘোষণা করিয়া যেভাবে আত্মহত্যা করিতেছে, তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আমরা দিয়াছি। আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। "বর্ণ ব্রাহ্মণ" নামে এক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ আছেন, তাহা হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাদের পাতিত্যের কারণ কি? যতদূর জানা যায়, এই ব্রাহ্মণেরা শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিদের পৌরোহিত্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের পাতিত্যদোষ ঘটিয়াছে। যথা ধোপার ব্রাহ্মণ, নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ, জেলের ব্রাহ্মণ—ইঁহারা সকলেই "বর্ণ ব্রাহ্মণ" এবং সাধারণ ব্রাহ্মণের নিকট হীন, পতিত বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বকালে যাঁহারা গ্রহপূজা, কোষ্ঠী

বিচার প্রভৃতির ব্যবসা করিতেন, তাঁহারা ছিলেন গ্রহবিপ্র। এই 'গ্রহবিপ্রেরা'ও হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। শ্রাদ্ধের পিণ্ডাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন,—সেই "অগ্রদানী" ব্রাহ্মণেরাও হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। ভাট, চারণ, নট প্রভৃতির কার্য্য যে সব ব্রাহ্মণ করিত, তাহারাও হীন বলিয়া গণ্য হইত। তাহাদের বংশধরেরা এখনও সেই পাতিত্য দোষে লাঞ্ছিত। পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ "জাতিভেদ" গ্রন্থে মনুসংহিতা ও অন্যান্য স্মৃতি গ্রন্থ হইতে বহুশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, হিন্দু সমাজে "বৃত্তির দোষে" ও অন্যান্য তথাকথিত "অপরাধে" কত লোক হীন ও পতিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সেই সুদীর্ঘ তালিকা দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের দেশাচার ও লোকাচার স্মৃতির অনুশাসনও ছাড়াইয়া গিয়াছে। নূতন নূতন কারণে পাতিত্য দোষ ঘটিয়াছে। এইরূপে হিন্দু সমাজ কেবলই নিজেকে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, খণ্ডবিখণ্ড করিতে করিতে চলিয়াছে, আর সকলকে হাঁকিয়া বলিতেছে—'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও'!

জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ লইয়া হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার উপর প্রবল আঘাত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম উহাকে অপূর্ব্ব কৌশলে গ্রাস করিয়া ফেলিল, জাতিভেদ প্রথা আরও বেশী শক্তিশালী হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া হিন্দু সমাজকে আচ্ছন্ন করিল। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহস্র বৎসরের কাজ বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া গেল।

কিন্তু জাতিভেদের বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহের বাণী একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। নানা আকারে, নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া সে জাতিভেদকে আঘাত করিয়া আসিয়াছে, এখনও করিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে প্রবল বন্যা আসিয়াছিল, তাহা প্রায় একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্য, মধ্যভারতে কবীর এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক এই বিদ্রোহের পতাকাধারী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম যে মহান আদশের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে জাতিভেদের স্থান নাই। তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেন,—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।

অথবা,—

‘মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।’

বৈষ্ণব কবি লোচন দাস সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিলেন—

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ।

এগুলি শুধু মুখের কথা নয়, কার্য্যতও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণ ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন—‘আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।’ তখনকার সমাজ পরিস্থিতি বিবেচনা করিলে, এই ধর্ম্মান্দোলনের গুরুত্ব যে কত বেশী, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইসলাম ধর্ম্ম তাহার সাম্যবাদ লইয়া বিজয়ী বেশে এদেশে তখন আবির্ভূত হইয়াছে। একদিকে সমাজের উপেক্ষা ও নির্য্যাতন, অন্যদিকে ইসলামের সাম্যের আদর্শ ও শাসক জাতির প্রলোভন—এই উভয়ের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু

সমাজের নিম্নজাতিগুলি দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল। যে সব "নির্য্যাতিত ও ভ্রষ্টাচার" বৌদ্ধ অথবা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিল, তাহারা তো সাগ্রহে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। হিন্দু সমাজের এই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে মহাপ্রভু যদি তাঁহার প্রেমধর্ম্মের আদর্শ লইয়া না দাঁড়াইতেন, তবে বাঙলার হিন্দুসমাজের অবস্থা কি হইত বলা যায় না। আজকাল কোন কোন গোঁড়া সনাতনী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, মহাপ্রভু জাতিভেদে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর ধর্ম্মের আদর্শ, তাঁহার কার্য্যাবলী এবং তাঁহার ভক্ত ও পার্ষদগণের আচরণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার প্রেমধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল। প্রথমেই দেখা যাক, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায় ও মুখপত্র কাহারা। রূপ সনাতন দুই ভাই যে ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অথচ এই রূপ সনাতনই মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের প্রধান সেনাপতিদ্বয়। এই দুই পতিত ব্রাহ্মণকে কেবল তিনি 'কোল দেন' নাই, তাঁহাদিগকে প্রেমধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দিয়া মানব-সমাজের শিরোমণি করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচারের অন্যতম প্রধান সহায় শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত, জাতিবিচার তিনি মানিতেন না। বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে প্রধানত নিত্যানন্দই প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। কোন কোন মনীষী তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক সেণ্ট পলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে জগতে এত বড় ধর্ম্মপ্রচারক আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। ঠাকুর হরিদাস বা যবন হরিদাস ছিলেন মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। তিনি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরম বৈষ্ণব হন। এত বড় মহান চরিত্র যে

কোন দেশে, যে কোন যুগে দুর্ল্লভ। মহাপ্রভু যে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, তাহা "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের" পাঠক মাত্রেই জানেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের সমাজপতি—নিষ্ঠাবান সনাতনী এবং বৈদান্তিক পণ্ডিত। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রভাবে পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব হইয়া উঠেন। শ্রীনিত্যানন্দকে তিনি কুলত্যাগী ও জাতনাশা বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণব হইয়া তিনি নিজেও জাতি-বিচার করিতেন না। যবন হরিদাস বা ঠাকুর হরিদাসকে ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যই শ্রাদ্ধের অন্ন নিবেদন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বহু অ-ব্রাহ্মণ,—বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি গুরুর আসন অধিকার করিয়াছেন,—সনাতন ব্রাহ্মণ্যাচারের বিরুদ্ধে ইহা একটা বড় রকমের বিদ্রোহ। মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বহু অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অনাচরণীয় জাতি বাঙ্গলাদেশে "জলচল" ও "আচরণীয়" হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সম্মুখে দিগ্বিজয়ের একটা নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছিল। বহু আদিম ও অনার্য্য জাতি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী আসাম ও মণিপুরের পাহাড়িয়া জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যদি পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ধারা অনুসরণ করিতেন, তবে বাঙলার প্রান্তভাগের সমস্ত আদিম, অনার্য্য ও পাহাড়িয়া জাতিরা হিন্দু হইয়া যাইত এবং আজ যে আমরা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিয়াছি, বহুকাল পূর্ব্বেই তাহার একটা সমাধান হইত।

কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কৌশলী ব্রাহ্মণেরা একদিন যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রতিও তাঁহারা অনুরূপ আচরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যখন গুরু ও গোস্বামী বেশে

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখনই উহার মধ্যে আবার সেই সনাতনী মনোবৃত্তি আসিয়া প্রবেশ করিল, জাতিভেদ—উচ্চনীচভেদের মহিমা প্রচারিত হইতে লাগিল। এমন-কি, এই সব ব্রাহ্মণ গোস্বামীদের প্রভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য নূতন স্মৃতিশাস্ত্রই রচিত হইয়া গেল। যে সব অস্পৃশ্য, অনাচরণীয়, অন্ত্যজ প্রভৃতি বৈষ্ণব হইয়া হিন্দু সমাজে কতকটা মর্য্যাদালাভ করিয়াছিল, তাহারা 'জাত-বৈষ্ণব' নামে একটা স্বতন্ত্র জাতিতেই পরিণত হইল। অর্থাৎ জাতিভেদের কঠোরতা হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, হিন্দু সমাজে আর একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হইল। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে সমাজ সংস্কারের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল, সনাতনী ব্রাহ্মণেরা এইভাবে তাহার গতিরোধ করিলেন।

গুরু নানক যে ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে জাতিভেদের স্থান ছিল না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নবম গুরু গোবিন্দ সিং মোগল সম্রাটদের অত্যাচার হইতে এই শিখ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য উহাকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি বিচার ছিল না,—ব্রাহ্মণ, জাট, রাজপুত—সকল শিখই ছিল সমান। কিন্তু সনাতন হিন্দুসমাজ এতটা সাম্যবাদ বরদাস্ত করিতে পারিল না। ফলে শিখ সম্প্রদায় হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া গেল, শিখধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইল। আজ পাঞ্জাবে শিখেরা একটা শক্তিশালী ধর্ম্ম সম্প্রদায়, হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ তাহারা স্বীকার করে না। তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। পাঞ্জাবের হিন্দুসমাজ যে এইভাবে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল, ইহার জন্য দায়ী কে?

হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আর একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দিব। উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও মধ্যভারতে "মহিমাধর্ম্ম"

নামে একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নাম অনেকেই হয়ত শুনিয়াছেন। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে উড়িস্যার দেশীয় রাজ্যে মহিমা গোসাই নামক জনৈক সাধু এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে এই ধর্ম্ম বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ও পীঠস্থানে (জোড়নদা—ঢেনকানাল) আমরা গিয়াছি এবং সমস্ত বিষয় মোটামুটী জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। এই ধর্ম্মের মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহাতে মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট ইহা বহুল পরিমাণে ঋণী। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ত ইহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মই বলিয়াছেন। কিন্তু এই ধর্ম্মের ধর্ম্মতত্ত্ব আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সামাজিক ব্যবস্থাই আমাদের লক্ষ্যস্থল। ইহারা নিজেদের "হিন্দু"ই বলে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই,—ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ, ধোপা, মুচি, ডোম—মহিমা ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, সকলেই সমান বলিয়া গণ্য হয়। পরস্পরের মধ্যে আহার-ব্যবহার ও বিবাহের আদান-প্রদান চলে। ইহাদের মধ্যে বিবাহপদ্ধতিও সনাতন হিন্দুপ্রথা সম্মত নহে। বলা বাহুল্য, সনাতন হিন্দু সমাজ ইহাদের এই চরম সাম্যবাদ বরদাস্ত করিতে পারে নাই,—মহিমা সম্প্রদায়কে তাহারা হীন ও পতিত বলিয়াই গণ্য করে।

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ

বহুজাতিভেদ যে হিন্দুসমাজের দৌর্ব্বল্য ও সঙ্ঘবদ্ধহীনতার প্রধান কারণ, নিতান্ত অন্ধ ভিন্ন একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। মুসলমান সমাজে বংশগত জাতিভেদ নাই,—ইসলামের দৃষ্টিতে সব মুসলমানই সমান। তাহারা সকলেই এক সঙ্গে মসজিদে নামাজ পড়িতে পারে, একসঙ্গে আহার-ব্যবহার করিতে পারে,—এমন কি বিবাহের আদান-প্রদানেও কোন বংশগত দূরতিক্রমণীয় বাধা নাই। প্রত্যেক

মুসলমানই জানে যে, সে যতই দরিদ্র হোক, বিশাল মুসলমান সমাজেরই একজন। সে বিপন্ন হইয়া হাঁক দিলে আর দশজন মুসলমান ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিবে। এমন কি, সে যদি কোন অন্যায় কার্য্যও করে, তাহা হইলেও তাহাকে সমাজের পক্ষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হইবে। মুসলমান সমাজের এই বৈশিষ্ট্য তাহার একটা প্রচণ্ড শক্তি। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে Herd instinct, group consciousness—"গোষ্ঠীচৈতন্য" বা সঙ্ঘচৈতন্য বলে,—মুসলমান সমাজে তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এই group consciousness —সঙ্ঘচৈতন্য বা গোষ্ঠীচৈতন্যের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যেরূপ প্রকৃতিরই হোক না কেন, তাহারা সকলে যখন কোন গোষ্ঠী বা সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সেই গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ যেন একটা স্বতন্ত্র সত্তা হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই সত্তার স্বতন্ত্র মন ও ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হয়। সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীর মতামত এবং সিদ্ধান্তই তখন ব্যক্তিকে পরিচালিত করে। একক ব্যক্তি দুর্ব্বল ও অসহায় হইতে পারে, কিন্তু সঙ্ঘশক্তি বলে সেও প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠে। জনৈক পাশ্চাত্য মনীষী এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

A member of a large assemblage is more sensitive to the voice of the herd than any other influence. It can inhibit or stimulate his thought or conduct ; it is the source of his moral codes, of his ethics and philosophy. It can endow him with energy, courage and endurance.

মুসলমান সমাজ যে সঙ্ঘশক্তি বলে বলীয়ান তাহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বদাই পাইতেছি। কিন্তু জাতিভেদের ফলে শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজে এই সঙ্ঘশক্তির একান্ত অভাব। হিন্দু সমাজের গঠনই এমন যে, তাহাতে

কেবল স্বতন্ত্রীকরণের প্রবৃত্তিই বাড়িতে থাকে। কোন একটী গ্রামের হিন্দু সমাজের কথা চিন্তা করিলেই আমাদের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হইবে। একটা বড় গ্রামের হিন্দুসমাজে অন্ততপক্ষে ৩০।৪০ রকমের জাতি আছে। উহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক দল বিশেষ, কাহারও সঙ্গে কাহারও বন্ধন নাই। তথাকথিত উচ্চজাতিরা "নিম্নজাতি"দিগকে করুণামিশ্র অবজ্ঞার চোখে দেখে, নিম্নজাতিরাও স্তর ভেদে নিম্নতর জাতিদিগকে ঠিক সেই ভাবেই দেখে। কোন নিম্নজাতীয় হিন্দু বিপদগ্রস্ত হইলে উচ্চজাতীয়েরা তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় না। কেননা তাহারা যে একই বিশাল হিন্দুসমাজের অন্তর্গত এ বোধ পরস্পরের মনে জাগ্রত হয় নাই। সকলকে একই সঙ্ঘশক্তির পতাকাতলে সমবেত করিবার চেষ্টা করা দূরের কথা,—সামান্য ভুল, ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়া অন্যকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার প্রবৃত্তিটাই বেশী। চলিত ভাষায় ইহারই অপর নাম জাতিচ্যুত বা 'একঘরে' করা। এই প্রবৃত্তি যেখানে প্রবল, সেখানে কোন কালেই সঙ্ঘশক্তির বিকাশ হইতে পারে না, "আমি হিন্দু" এই কথা ভাবিয়া কেহ বল ও ভরসাও পাইতে পারে না। জন কয়েক উচ্চ বর্ণের লোক বেদ বেদান্ত উপনিষদের শ্লোক আওড়াইয়া হিন্দুধর্ম্ম তথা আর্য্যকীর্ত্তির গৌরব ঘোষণা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু সাধারণের উহাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তাহারা পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গেই ঐ সব কথা শুনে। হিন্দুসমাজের ক্ষয়রোগের নিদান নির্ণয় করিতে হইলে এই Psychological factor বা মনোবিজ্ঞানের তথ্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। একজন মুসলমান জানে, তাহার পিছনে সমগ্র মুসলমানসমাজ আছে, কিন্তু একজন হিন্দু ঠিক সেইভাবে, সে যে বিশাল হিন্দুসমাজের একজন একথা অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করিতে পারে না। ব্যক্তিহিসাবে সে দুর্ব্বল, অসহায়, বিরাট সঙ্ঘশক্তির মধ্যে তাহার

স্থান নাই। ইহার ফলে সাধারণভাবে হিন্দুর জীবনীশক্তি যদি হ্রাস হয়, তাহার লোকসংখ্যার হার নিম্নাভিমুখী হয়, তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়,—বরং এই উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। হিন্দু সমাজ হইতে যে এত লোক বাহির হইয়া গিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বা করিতেছে, তাহার সঙ্গেও এই সঙ্ঘশক্তিহীনতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

জাতিভেদেরই সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে সংস্পৃষ্ট "অস্পৃশ্যতা" হিন্দুসমাজের দৌর্ব্বল্য ও সঙ্ঘবদ্ধহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ। "অস্পৃশ্যতা" কিরূপে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিল, তাহার গবেষণা ঐতিহাসিকেরা করিবেন। খুব সম্ভব আর্য্য-অনার্য্য সংস্পর্শের ফলে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। নিজেদের "রক্তের বিশুদ্ধিতা" রক্ষার জন্যই আর্য্যগণ এই পন্থা প্রথমত অবলম্বন করিয়াছিলেন, ঠিক যেভাবে নাৎসী জার্ম্মানী আজ ইহুদী বিতাড়ন এবং বিবাহের কঠোর আইন-কানুন করিয়া বিশুদ্ধ আর্য্য জার্ম্মানবংশ রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সন্দেহ হয়, ভারতের আর্য্যদের মধ্যে 'অস্পৃশ্যতা' জাতিভেদ প্রথা অপেক্ষাও প্রাচীন। পরবর্ত্তীকালে জাতিভেদ প্রথা বদ্ধমূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'অস্পৃশ্যতা'ও হিন্দুসমাজে শিকড় গাড়িয়া বসিল। জাতিভেদ প্রথা যেমন বহু শাখাপ্রশাখায় আজ হিন্দুসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে,—অস্পৃশ্যতাও তেমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও স্মৃতিনিবন্ধে এই অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধে যে বিধি বিধান আছে, দেশাচার ও লোকাচার তাহাকে আরও জটিল ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। ফলত লৌকিক আচারে অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র স্মৃতিশাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যথা অবাঞ্ছিতের দর্শন ও স্পর্শন বাঁচাইয়া চলা, যদি কোন কারণে ঐরূপ দোষ ঘটে তবে স্নান করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র

হওয়া, অন্যের স্পৃষ্ট আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণ না-করা, এই উদ্দেশ্যে রান্নাঘর ও "ভাতের হাঁড়িকে" অতি সযত্নে ও নিরাপদে রক্ষা করা, অন্যের সঙ্গে একাসনে না-বসা, এক পংক্তিতে ভোজন না-করা ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙলার হিন্দুসমাজের মধ্যে 'অস্পৃশ্য' ও 'অনাচরণীয়' দুই রকম ভেদ আছে; অনাচরণীয়দের স্পর্শ করা যায়, কিন্তু তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন-পানীয় গ্রহণ করা যায় না, তাহাদের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারও চলে না; —আর অস্পৃশ্যদের দেহ এমন কি ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে 'দোষ' হয় এবং তাহার জন্য স্নান করিয়া ও ইষ্টমন্ত্র জপিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। অস্পৃশ্যেরা এবং কতকগুলি 'অনাচরণীয়' জাতিও দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাদের স্বতন্ত্র মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে যে সব পুরোহিত ব্রাহ্মণ পূজা করে, তাহারাও অনাচরণীয়, এমন কি কোন কোন স্থানে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য। এই অস্পৃশ্যতার ব্যাধি আরও কতদূর নামিয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শন—নাপিতেরা হিন্দুসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি নিম্নজাতির ক্ষৌরকার্য্য করে না, পাটনীরা তাহাদিগকে নৌকায় পার করে না ও ধোপারা তাহাদের কাপড় কাচে না। (অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল হতভাগ্য জাতিরাই যখন মুসলমান বা খৃষ্টান হয়, তখন তাহাদের ক্ষৌরকার্য্য করিতে, কাপড় কাচিতে বা তাহাদিগকে পার করিতে উহাদের আপত্তি হয় না।)

ফলে "অস্পৃশ্যতা" হিন্দুসমাজের মধ্যে এরূপ একটা জঘন্য, অস্বাভাবিক, এমন কি পাশবিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উহার নিন্দা করিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! পৃথিবীতে কোথাও ইহার তুলনা নাই। এই 'অস্পৃশ্যতা' যে হিন্দুসমাজকে ক্রমে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তাহাকে তিলে তিলে ধ্বংস করিতেছে, তাহা প্রতিনিয়তই আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। মানুষের ঘৃণার উপর যে প্রথার প্রতিষ্ঠা

তাহা কস্মিনকালে কোন সমাজের কল্যাণ করিতে পারে না, উহাকে মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যায়। হিন্দুসমাজে বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইয়া এই আত্মহত্যাকর প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু বটগাছের শিকড়ের মত হিন্দুসমাজের জরাজীর্ণ অট্টালিকাকে উহা এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ভেদ করিয়াছে যে, উহা নির্ম্মূল করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীনকালের বুদ্ধ, চৈতন্য, কবীর, নানক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত অনেকেই হিন্দুসমাজের এই জঘন্য প্রথা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু জাতিভেদের ন্যায় এই অস্পৃশ্যতা ব্যাধিও দূর করিতে না পারিলে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই।

বিবাহ সমস্যার জটিলতা

বহু জাতি উপজাতি ও শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হিন্দুসমাজ যে কেবল দুর্ব্বল ও সংহতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নহে, উহার ফলে বিবাহসমস্যা এই সমাজে অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি বিবাহ, সুতরাং এই প্রথার উপরে সমাজের উন্নতি বা অবনতি যে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। হিন্দুসমাজে বহু জাতি উপজাতি শ্রেণী শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হওয়ার ফলে বিবাহের ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বিবাহযোগ্য পাত্র ও পাত্রী পাওয়াই অনেক সময় দুর্ঘট। অনেক স্থলে পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে রক্তের

সম্বন্ধ এমন ঘনিষ্ঠ হয় যে, বিবাহের ফল কখন ভাল হইতে পারে না,—বংশানুক্রমের নিয়ম (Law of heredity) অনুসারে জাতির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পৃথক দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতির (Race) মধ্যে বিবাহ যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, তেমনি যাহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ নিকটতম তাহাদের মধ্যে বিবাহও প্রশস্ত নহে।

জাতিভেদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া বিবাহ ব্যাপারে হিন্দুসমাজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মোটামুটি একটা হিসাব করা যাক। ডাঃ ভগবান দাস বলেন যে, সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজের জাতি উপজাতি শ্রেণী শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বিচার করিলে প্রায় তিন হাজার বিভাগ হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র বাঙলাদেশের হিন্দুসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও ডাঃ ভগবান দাসের মন্তব্য অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইবে না। বাঙলার হিন্দু সমাজ "ছত্রিশ জাতিতে বিভক্ত" এইরূপ একটা চলতি কথা আছে। প্রকৃতপক্ষে জাতির সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী, বোধ হয় কয়েক শতের কম হইবে না। কেন না সম্ভব অসম্ভব সমস্ত রকম বিভিন্ন বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া এক একটা স্বতন্ত্র জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। যে সমস্ত আদিম জাতি ও পাহাড়িয়া জাতিরা হিন্দু সমাজের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাও এক একটা স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছে। এই "কয়েক শত জাতির" মধ্যে আবার উপজাতি, শ্রেণী, শাখা, প্রশাখা আছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চজাতিদের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী বা সারস্বত, শাকদ্বীপী—এই কয়েকটি প্রধান বিভাগ আছে। বাগড়ী ব্রাহ্মণ নামেও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, কিন্তু ইহারা বর্ত্তমানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অন্যতম শাখা বলিয়া

গণ্য। প্রাচীন বাঙলায় রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ, মিথিলা—এই কয়েকটি বিভাগ ছিল। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বাগড়ী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের নাম এই সমস্ত বিভাগ হইতেই হইয়াছে। এইসব প্রধান বিভাগ ছাড়া বর্ণ ব্রাহ্মণ, ভাট ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও আছে। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আবার শ্রেণীভেদ ও শাখা প্রশাখা ভেদ আছে। যথা—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় প্রভৃতি ভেদ আছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা তো আছেই, তাহা ছাড়া নয়টি পটী আছে।* বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাশ্চাত্য বৈদিক ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এই দুই শাখা আছে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্রদের মধ্যেও দুইটি শাখা—রাঢ়ীয় ও নদীয়া বঙ্গসমাজ আছে। এই নদীয়া বঙ্গসমাজেরই একটি শাখা বারেন্দ্র সমাজ। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথাও আছে।

কায়স্থদের মধ্যে উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ এই ৪টি প্রধান শ্রেণী আছে। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণদের ন্যায় কায়স্থদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার কুলীন, মৌলিক প্রভৃতি ভেদ আছে। বৈদ্য জাতির মধ্যেও রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ আছে।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও শাখা প্রশাখার ভিতর পরস্পর বিবাহ হয় না। যথা—রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহ হয় না, সপ্তসতী বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বিবাহ হয় না। কায়স্থ ও বৈদ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও বিবাহ চলে না। আজকাল বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থদের পরস্পরের মধ্যে ২।৪টা বিবাহ হইতেছে বটে, কিন্তু উহার সংখ্যা নগণ্য, কায়স্থ সমাজে

* মহিমচন্দ্র মজুমদার—'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'

তাহা 'শিষ্ট বিবাহ' বলিয়া এখনও প্রসন্ন মনে গৃহীত হয় না। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহ হয় না বলিলেই ঠিক হয়। ইদানীং যে ২।১টি বিবাহ হইয়াছে, তাহা ঐ দুই সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয় নাই। আমি জানি, কোন রাঢ়ী ব্রাহ্মণের পুত্র বারেন্দ্র কন্যাকে বিবাহ করাতে পিতা মনের ক্ষোভে গৃহত্যাগ করেন।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই উভয় জাতির মধ্যেই কৌলীন্য প্রথা বিবাহের জটিলতা আরও বৃদ্ধি এবং নানাদিক দিয়া সমাজের ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে। কৌলীন্যের অনিষ্টকর প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে। কৌলীন্য প্রথা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কিরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহার ফলে বিবাহ সমস্যা অসম্ভব রকম জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার একটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত, বংশানুক্রমিক ছিল না।...বল্লাল সেনের পরে দুইটা বিষয়ে নিয়ম প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়া কৌলীন্য প্রথাটিকে জটিল করিয়া তুলিল। লক্ষ্মণ সেন নিয়ম করিলেন যে, কুলীন কন্যা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে, আবার সেই ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার নাম বংশ পরিবর্ত্তন। দ্বিতীয়তঃ, কুলীনদের মধ্যে কে কিরূপ উচ্চনীচ কুলে আদানপ্রদান করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া কুলীনদের পদমর্য্যাদার সমতা স্থির করা হইবে। ইহার নাম সমীকরণ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে ইহার প্রচলন হয়, বারেন্দ্র সমাজে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। প্রথম সমীকরণে সাতজন কুলীন সমান বলিয়া গণ্য হইলেন। দ্বিতীয় সমীকরণে চৌদ্দজন সমান বলিয়া গণ্য হইলেন। ইহারাই কুলীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইলেন। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মণ সেনের সময়েই জটিল দার্শনিকতত্ত্বের দ্বারা কৌলীন্যের

ব্যাখ্যা হয় এবং সূক্ষ্ম ন্যায়ের তর্ক দ্বারা কৌলীন্যের উৎকর্ষ স্থির করার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।"*

লক্ষ্মণ সেনের কয়েক শত বৎসর পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে দেবীবর ঘটক "মেলবন্ধন" করিয়া কৌলীন্য প্রথাকে জটিলতম করিয়া তুলিলেন। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ হইতে পুনরায় আমরা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—"দেবীবর দেখিলেন সকল কুলীনই অল্পবিস্তর দোষাশ্রিত। যাঁহাদের বেশী দোষ ছিল অথবা যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ ছিলেন, দেবীবর তাঁহাদিগকে নিষ্কুলীন করিলেন। তাঁহারা দেবীবরের ছাঁটা 'বংশজ' বলিয়া গণ্য হইলেন। অল্প দোষাশ্রিত অন্য কুলীনগণকে দেবীবর ছত্রিশভাগে অথবা মেলে বিভক্ত করিলেন। মহারাজ বল্লাল সেন গুণ অনুসারে কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়াছিলেন, আর দেবীবরের বিধানে যে দোষী, তিনি প্রধান কুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন। এক এক প্রকার দোষে দুষ্ট কুলীনদিগকে লইয়া এক এক 'মেল' সৃষ্ট হইল। দেবীবর প্রতি মেলে দুই দুইজনকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাঁহার হইতে মেলের উৎপত্তি তিনি 'প্রকৃতি' এবং তাঁহার সহিত কুল করিয়া যিনি সমমর্য্যাদাসম্পন্ন হইলেন, তিনি 'পালটি'। দেবীবর নিয়ম করেন, প্রত্যেক মেলের মধ্যে যে যাহার প্রকৃতি, যে যাহার 'পালটি'—তাঁহাদেরই মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান বা কুলকার্য্য চলিতে পারিবে। তাহার বাহিরে কেহ কুলকার্য্য করিতে পারিবে না, করিলে কুল নষ্ট হইবে।"†

---

* কৌলীন্য প্রথা—'ভারতবর্ষ'।

† দেবীবর ঘটকের এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটা হয়ত উদার উদ্দেশ্য ছিল। যে ব্রাহ্মণদের বংশে 'পাঠান দোষ' ও 'মোগল দোষ' (ব্যাখ্যা অনাবশ্যক) ঘটিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহাদিগকে সমাজের মধ্যে স্থান দিবার জন্য তিনি "দোষের" উপর ভিত্তি করিয়া মেলবন্ধন করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, মূঢ় ব্যবস্থার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে বহুবিবাহ প্রবেশ করিল। অনেক সময়ে বহুবিবাহেও কুলাইত না, কন্যারা অবিবাহিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত। ইহার ফলে যে ঘোর দুর্নীতি ও অনাচার ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ করিল, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী জাতি তাহার ফল ভোগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ৫০।৬০ হইতে ১০০।১৫০টি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেন। তাহাও আবার বহু অর্থ দিয়া এই সব কুলীন জামাইকে সংগ্রহ করিতে হইত। বিবাহের পরও কন্যারা অনূঢ়ার মত পিতৃগৃহেই থাকিয়া যাইত। কৌলীন্যের ফলে অনাচার ও ব্যভিচার সমাজে কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন তৎকৃত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে তাহার জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজকে কষাঘাত করিয়াছেন। ইদানীং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বামুনের মেয়ে" উপন্যাসেও কৌলীন্য প্রথার শোচনীয় পরিণতি আর একদিক দিয়া দেখানো হইয়াছে। প্রধানত পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় এই 'বহুবিবাহ প্রথার' প্রাবল্য হ্রাস পায়।*

কুলীনদের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া যেমন দুঃসাধ্য, "বংশজ"দের মধ্যে তেমনি আবার ছেলের বিবাহ দেওয়া দুঃসাধ্য। ইহাদিগকে কন্যা সংগ্রহের জন্যই 'পণ' দিতে হয়। ফলে অনেক বংশজ ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারে না, হয়ত বৃদ্ধ বয়সে শেষ পর্য্যন্ত একটি বালিকার পাণিগ্রহণ

* পূর্ব্ববঙ্গে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া বেড়াইয়া বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিতেন। তিনি নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বহুবিবাহ করিয়া উহার কুফল ভোগ করিয়াছিলেন।

করিতে বাধ্য হয়। আবার কন্যা বিক্রয় করিয়া মূল্য পাইবার লোভে প্রতারকেরা বহু অ-ব্রাহ্মণের কন্যাকেও ব্রাহ্মণকন্যা পরিচয় দিয়া বিবাহ দেয়। পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা বহু ঘটিত, বর্ত্তমানকালে উহার সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে এ বিষয়ে হিন্দুসমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ১৮৩৭ সালের ১৭ই জুন তারিখের "সমাচার দর্পণ" সংবাদপত্রে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত পত্র হইতে পাওয়া যায় :—

"সম্পাদক মহাশয়, এ দেশের কুলীন বংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন। তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন। বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, কিন্তু তাহাতে অনেক জাতির কন্যা চলিয়া যায়। অধিক কি কহিব, কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যা পর্য্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন, আমি ইহার একক প্রমাণ লিখিতেছি। (ইহার পর বর্দ্ধমানের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে।) ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীতকন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষে জানিলেন, পোদ জাতীয় বৈষ্ণবের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা সহরের মধ্যে এরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, ভারিভারি পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান প্রধান বাঁড়ুয্যের ঘরে যে, তাঁহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন, তাহাদিগের অনেকেই ধোপা, নাপিত, বৈষ্ণব, মালি, কামার, কাপালিক কন্যা, কিন্তু সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্র ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।*

---

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী সমাজের সমস্যা"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

"ভরার মেয়ে" কথাটি কেহ কেহ হয়ত শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে হিন্দুসমাজের কৌলীন্য প্রথার কি শোচনীয় ক্ষত লুক্কায়িত আছে, তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। পশ্চিম বঙ্গে যেমন, পূর্ব্ববঙ্গেও তেমনই এই কৌলীন্যের ফলে বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যার অভাবে বিবাহ করিতে পারিতেন না ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার ফলে 'কন্যা ব্যবসায়ী' এক দল লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা অন্যান্য স্থান হইতে কন্যা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে বিবাহার্থী বংশজ ব্রাহ্মণদের নিকট বিক্রয় করিত। এইসব মেয়ে প্রায়ই নিম্নজাতীয়া হইত, কিন্তু বিবাহার্থী ব্রাহ্মণেরা নির্ব্বিচারে তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতেন। 'ভরা' বা নৌকাতে করিয়া কন্যা ব্যবসায়িগণ এইসব মেয়েকে বিক্রয়ার্থ আনিত বলিয়া লোকে চলতি কথায় ইহাদিগকে 'ভরার মেয়ে' বলিত। যে 'রক্তের বিশুদ্ধতা' রক্ষার জন্য কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি—সেই 'রক্তের বিশুদ্ধিতা' রক্ষা এইভাবেই হইত! কৌলীন্য প্রথার কৃপায় ব্রাহ্মণ সমাজে কত যে নিম্ন বর্ণের রক্ত মিশিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। "কুলীনের ছেলে" সেকালে একটা গালি বলিয়া গণ্য হইত।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ প্রভৃতিতেও কৌলীন্য প্রথা ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'করণ' প্রথার নাম কেহ কেহ হয়ত শুনিয়াছেন। প্রথাটি বড়ই অদ্ভুত। উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পাওয়া গেলেও মেয়েকে যোগ্য অকুলীন পাত্রে যদি কেহ দান করেন, তবে তাঁহাকে এই 'করণ' প্রথার আশ্রয় লইতে হয়। প্রথমে একটি 'কুশপুত্তলিকা'রূপী কুলীন বরের সঙ্গে কন্যাকে বিবাহ দিতে হয়, তারপর ঐ 'কুশপুত্তলিকা' দাহ করিয়া আসল 'অকুলীন' বরের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়। কৌলীন্য প্রথার ইহা যে কত বড় হাস্যকর পরিণতি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। "মনকে চোখ ঠারিতে" গিয়া লোকে যে প্রকৃতপক্ষে

বিধবা কন্যার বিবাহ দিত ইহা ভাবিত না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে যেমন 'করণ' প্রথা, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে তেমনই 'আদ্যিরস'। ইহা 'করণ' প্রথার তুলনায় অত্যন্ত নিষ্ঠুর। মৌলিক গোষ্ঠীপতি কায়স্থ তাঁহার কন্যাকে কোন মুখ্য কুলীনের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবার পূর্ব্বে, প্রথমে ঐ কুলীন ছেলেকে একটি কুলীনের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াইতেন। ইহাতে ছেলের "কুলরক্ষা" হইত। তারপর ঐ ছেলেকে গোষ্ঠীপতি মৌলিক নিজের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতেন। ইহাকেই বলে "আদ্যিরস"। বলা বাহুল্য, এরূপ বিবাহে প্রথমোক্ত কুলীনের মেয়েটি প্রায়ই পরিত্যক্তা হইত এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী গোষ্ঠীপতি মৌলিকের কন্যাকে লইয়াই স্বামী বাস করিত। দীনবন্ধু মিত্রের "জামাইবারিক্" ব্যঙ্গনাট্যে রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে কৌলীন্যের এই সব অনাচার সম্বন্ধে শ্লেষাত্মক চিত্র আছে।

কৌলীন্য প্রথা এবং তাহার আনুসঙ্গিক রীতিনীতি হিন্দুসমাজের উচ্চ জাতিদের মধ্যে যে কিভাবে বিবাহসঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সামান্য কিছু পরিচয়ই আমরা দিলাম।

বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের লোকক্ষয়

বহুজাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা, বিবাহ-ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা ও আন্তর্ব্বিবাহ প্রভৃতির জন্য হিন্দুসমাজের সংহতি শক্তি হ্রাস হইয়া উহা যেমন ক্রমেই দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে প্রধানতঃ এই সব কারণেই হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যারও ক্ষয় হইতেছে। বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে এই লোকক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট, এমন কি উহা আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙলাদেশে অনেকেরই

হয়ত স্মরণ আছে যে, ১৯১০ সালে লেঃ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "A dying race" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮০-১৯০১ এই দুই দশকের আদমসুমারীর বিবরণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি দেখান যে, বাঙলার হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যার হার ক্রমশ হ্রাস হইতেছে, পক্ষান্তরে মুসলমান সমাজের লোকসংখ্যার হার ক্রমশ বাড়িতেছে। উহার অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বেও বাঙলায় যে-হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে তাহারাই সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেন এরূপ হইল? লেঃ কর্ণেল মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তিকায় উহার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিতেও চেষ্টা করেন। এই পুস্তিকা প্রকাশের ফলে শিক্ষিত সমাজে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকজন চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি এই সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে থাকেন। কেহ কেহ সমস্যাটাকে তুচ্ছ ও অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু অনেকেই উহার মূল অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর হইতে গত ৩০ বৎসরে এ বিষয়ে বহু ব্যক্তি আলোচনা করিয়াছেন এবং স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারে এই জটিল সমস্যার কারণ নির্ণয় ও তাহার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা নিজেও এ বিষয়ে বিবিধ সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া আলোচনা করিয়াছি।

লেঃ কর্ণেল মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তিকায় হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যার ক্ষয়ের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রধানত হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা, তাহাদের বৃত্তি, খাদ্যব্যবস্থা ইত্যাদির উপরেই জোর দিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা আইনজীবী প্রগাঢ় পণ্ডিত স্বর্গীয় কিশোরীলাল সরকার মহাশয় উহার প্রতিবাদ স্বরূপ "Dying race—how dying" নামক যে গ্রন্থ লিখেন, তাহাতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করেন, হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার দোষ নাই, ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যই বাঙলার

হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ। তিনি বলেন যে, পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গেই প্রধানত হিন্দুদের বাস এবং পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে প্রধানত মুসলমানদের বাস। আর যেহেতু পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ধ্বংস হইতেছে, সেই কারণে সমগ্র বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত সামান্য, সুতরাং মুসলমানের সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে বাড়িতেছে।

স্বর্গীয় সরকার মহাশয়ের সিদ্ধান্তে যে কিছু সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু উহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। বাঙ্গলা দেশ নদীমাতৃক—বাঙ্গলার হিন্দুসভ্যতা উত্তর ভারতের সভ্যতার মতই গাঙ্গেয় সভ্যতা। আর প্রাচীন কাল হইতে প্রধানতঃ পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গই হিন্দুদের আবাসভূমি এবং হিন্দু সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। বড় বড় হিন্দু রাজ্য এই সব অঞ্চলেই স্থাপিত হইয়াছিল। যাহাকে আমরা পূর্ব্ববঙ্গ বলি তাহা অপেক্ষাকৃত নূতন অঞ্চল। নিদারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ এবং কতকাংশে উত্তরবঙ্গ আজ ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া লোকবসতির অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। নদীমাতৃক বাঙ্গলাদেশের নদীর গতিপরিবর্ত্তন এবং ভাগীরথী ও তাহার শাখাপ্রশাখাগুলি হাজিয়া মজিয়া যাওয়াতেই এই বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীগুলির এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। তাহার ফলেই পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব। মানুষ চেষ্টা করিলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে নানা উপায় প্রয়োগ করিয়া এই নদীগুলিকে রক্ষা করিতে পারিত। তাহা তো তাহারা করেই নাই, উপরন্তু রেলওয়ে বাঁধ, সেতু, রাস্তা প্রভৃতি নির্ব্বোধের মত নির্ম্মাণ করিয়া নদী নালা ও স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথগুলির আরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার ফলে

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আরও দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে কৃষির অবনতি ও দারিদ্র্য। ডাঃ বেণ্টলী বহু পূর্ব্বেই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া, কৃষির অবনতি ও দারিদ্র্য এই তিনটীর সঙ্গে পারস্পারিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।* পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে আজ এই তিনটীরই যোগাযোগ ঘটিয়াছে। আর তাহার সমষ্টিফল স্বরূপ বাঙ্গলার এই অঞ্চল ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। যাহা ছিল এককালে বাঙ্গালার সমৃদ্ধিশালী এবং জনবহুল অঞ্চল, তাহাই এখন লোকশূন্য অরণ্য ও জলাভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত ভাগীরথীর দুই তীরে যে সব বড় বড় গ্রাম ছিল, সেগুলি আজ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যেহেতু এই পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গই ছিল হিন্দুপ্রধান, সেই কারণে এই দুই অঞ্চলের লোকক্ষয় বাঙ্গলার হিন্দু জনসংখ্যার উপর সমগ্রভাবে অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদীসংস্কার ও জলসেচের দ্বারা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইবে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে বহু উন্নত লোকসমাজ ও তাহার সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সময় থাকিতে উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গেরও সেই দশা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রভাবে বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতিও লোপ পাইবে।

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের লোকসমাজের ক্ষয় কিরূপ দ্রুত হইতেছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে :—

* Dr. Bentley—Malaria and Agriculture.

১৯০১—১৯২১

	কর্ষিত ভূমির হ্রাস (শতকরা)	ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি
বৰ্দ্ধমান	৪০	৫০'৪	+৩'৭
নদীয়া	৭	৫৭'৫	—৮ ১
মুর্শিদাবাদ	১৪	৪১'৭	+২২ ৯
যশোর	৩১	৪৮'২	—৭'২
হুগলী	৪৫	৬৬ ৬	+৬ ২

ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটী জেলার তুলনা করা যাক ;—দেখা যাইবে এখানে কর্ষিতভূমি ও লোকসংখ্যা কিরূপ দ্রুত বাড়িতেছে :—

১৯০১—১৯৩১

	কর্ষিতভূমির হ্রাসবৃদ্ধি	ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি
ঢাকা	+৫৭	৯'৭	+২৮'৯
মৈমনসিংহ	+১৯	১১'১০	+২৮'৫
ফরিদপুর	+১৩	২৬'৬	+২১ ৮
বাখরগঞ্জ	+২১	৮'৩	+২৭'১

* * * *

কিন্তু মোটের উপর পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের তুলনায় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের লোকসংখ্যা হ্রাস ও কৃষির অবনতি ঘটিলেও, কি ম্যালেরিয়াপ্রধান পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে, কি ম্যালেরিয়ামুক্ত পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে সর্ব্বত্রই মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর জনসংখ্যাহার ক্রমশ হ্রাস হইতেছে।

প্রত্যেক জেলার লোকসংখ্যা লইয়া তুলনামূলক আলোচনা করিলেও ঐরূপ শোচনীয় অবস্থাই দেখা যাইবে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে বাঙলার অনেক গ্রামের কথা জানি। সেখানে হিন্দু ও মুসলমান একই গ্রামে একই জলবায়ুর মধ্যে পাশাপাশি বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে, অথচ হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে, আর মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহার কারণ কি? কেবল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও ম্যালেরিয়ার দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বভাবতঃই মনে হয়, উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থা, জীবনযাপনপ্রণালী, আহারব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে এমন কোন পার্থক্য আছে, যাহার ফলে এই বিপরীত অবস্থা ঘটিতেছে।

ম্যালেরিয়ামুক্ত পূর্ব্ববঙ্গে তথা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে সর্ব্বত্রই মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর জনসংখ্যার হার কিরূপ হ্রাস হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা কয়েকটী হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। দেখা যায়, স্বাস্থ্যকর পূর্ব্ববঙ্গে যেমন, অস্বাস্থ্যকর মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গেও তেমনই হিন্দুরা ক্রমেই জীবনযুদ্ধে হটিয়া যাইতেছে:—

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ—হিন্দু (প্রতি হাজার)

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বর্দ্ধমান	৮০৩	৭৯৭	৭৯৩	৭৮০	৭৮৬
মুর্শিদাবাদ	৪৯৬	৪৮৩	৪৬৯	৪৫০	৪৩০
নদীয়া	৪১৯	৪০৬	৩৯৭	৩৯১	৩৭৫
যশোর	৩৯০	৩৮৭	৩৮০	৩৮১	৩৭৯

পূর্ব্ববঙ্গ—হিন্দু (প্রতি হাজার)

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বাখরগঞ্জ	৩১৬	৩১১	২৯৬	২৮৭	২৭৬
ফরিদপুর	৩৭৮	৩৭৯	৩৬৫	৩৬১	৩৫৯
ঢাকা	৩৮৬	৩৭৩	৩৫৫	৩৪২	৩২৭
মৈমনসিংহ	৩০১	২৭৮	২৫৭	২৪৩	২২৯
নোয়াখালি	২৪৬	২৪০	২৩০	২২৩	২১৫
ত্রিপুরা	৩১২	২৯৪	২৭৭	২৫৮	২৪১

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ—মুসলমান (প্রতি হাজার)

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বৰ্দ্ধমান	১৯২	১৮৮	১৮৯	১৮৫	১৮৬
মুর্শিদাবাদ	৪৯৫	৫০৮	৫২০	৫৩৬	৫৮৬
নদীয়া	৫৭৬	৫৮৯	৫৯৫	৬০২	৬১৮
যশোর	৬০৯	৬১২	৬১৯	৬১৮	৬২০

পূর্ব্ববঙ্গ—মুসলমান (প্রতি হাজার)

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বাখরগঞ্জ	৬৮৯	৬৮৩	৬৯৭	৭০৬	৭১৭
ফরিদপুর	৬১০	৬১৯	৬৩২	৬৩৫	৬৩৮
ঢাকা	৬০৯	৬২৩	৬৪০	৬৫৪	৬৬৮
মৈমনসিংহ	৬৯০	৭১৪	৭৩৪	৭৪৯	৭৬৬
নোয়াখালি	৬৫৩	৭৫৯	৭৭৮	৭৭৬	৭৮৫
ত্রিপুরা	৬৮৭	৭০৫	৭২২	৭৪১	৭৫৮

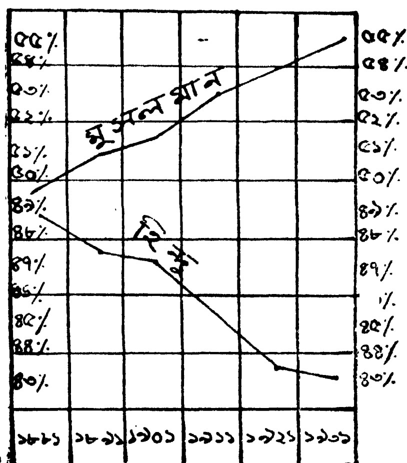
১৮৮১—১৯৩১ (পঞ্চাশ বৎসরে)

হিন্দু মুসলমানের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি

	পশ্চিমবঙ্গ	মধ্যবঙ্গ	উত্তরবঙ্গ	পূর্ব্ববঙ্গ	সমগ্রবঙ্গ
হিন্দু	১৫.৪	২৬.৭	১৩.১	৩৮.৯	২২.৯
মুসলমান	২৭.৭	২৭.৪	২৭.১	৮৭.৫	৫১.২

বাঙলার হিন্দু সমাজের লোকক্ষয়—২

বস্তুতঃ ১৯১০ সালে লেঃ কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বাঙলার হিন্দুসমাজের যে ক্ষয় ব্যাধি ধরিয়াছিলেন, তাহা প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর প্রবলাকার ধারণ করিতেছে। তাহার পর ১৯১১, ১৯২২ ও ১৯৩১ সালে তিনটি আদমসুমারী হইয়াছে। প্রত্যেক আদমসুমারীতেই হিন্দুসমাজের অবস্থা ক্রমশ অধিকতর শোচনীয় হইতেছে, লক্ষ্য করিতেছি। নিম্নে আমরা যে চিত্রটি (১নং চিত্র) দিলাম, তাহা হইতে বিষয়টি সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাইবে :—



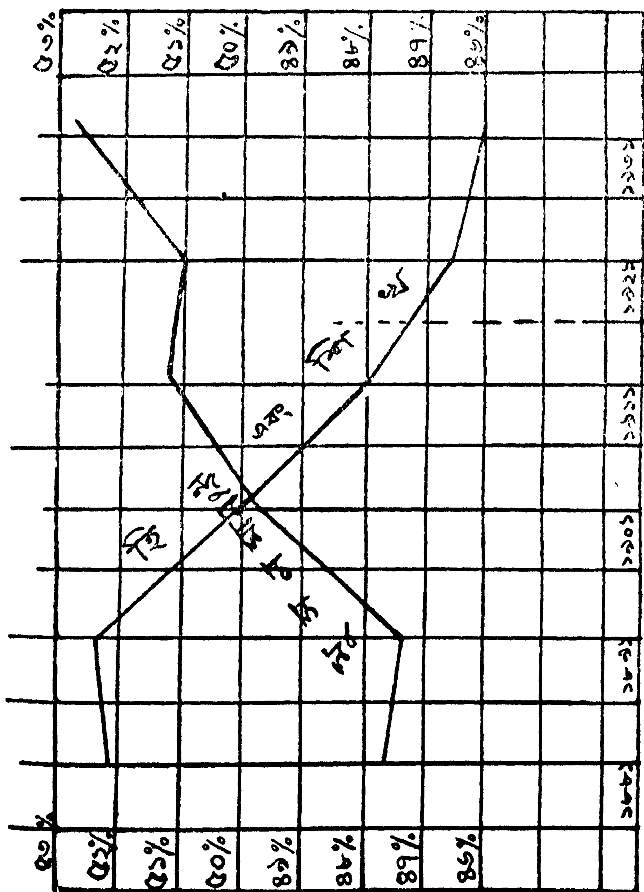
১নং চিত্র—বা

চিত্রে দেখা যাইতেছে, ১৮৮১ সালে বাঙলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল,—সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৪৯ ভাগ হিসাবে।

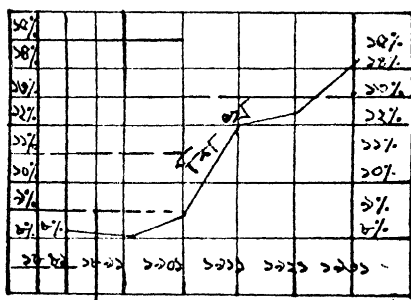
কিন্তু তারপর হইতেই মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ১৯৩১ সালে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে লোকসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগে। আর ঐ ১৮৮১ সাল হইতেই বাঙলায় হিন্দুদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস হইতেছে এবং ১৯৩১ সালে তাহাদের সংখ্যা আসিয়া নামিয়াছে শতকরা ৪৩ ভাগে। অর্থাৎ অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলার হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ হ্রাস হইয়াছে, আর মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ বাড়িয়াছে। এই অবস্থা বিপর্য্যয়ের কারণ কি, তাহা চিন্তাশীল বাঙালী হিন্দু মাত্রেরই গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যদি এইভাবে ক্রমাগত বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকে, তবে আগামী অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাহারা বাঙলাদেশে নগণ্য সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইবে;—এক শতাব্দীর মধ্যে জাতি হিসাবে লুপ্তপ্রায় হইবে, ইহাও অমূলক আশঙ্কা নহে।

১৮৮১-১৯৩১ এই পাঁচ দশকে (অর্থাৎ ৫০ বৎসরে) পাঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমানের লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তুলনা করিলে বাঙলার সঙ্গে আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য দেখা যায়। সম্প্রতি পাঞ্জাবের অধ্যাপক রুচিরাম সাহানা বিষয়টির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বাঙলা ও পাঞ্জাবের হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি সমগ্র হিন্দু ভারতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

২নং চিত্রে দেখা যাইবে, পাঞ্জাবের মুসলমানেরা ১৮৮১ সালে পাঞ্জাবের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৪৭½ ভাগ ছিল,—আর ১৯৩১ সালে তাহাদের সংখ্যা উঠিয়াছে লোকসংখ্যার শতকরা ৫২½ ভাগে। এই ৫০ বৎসরের মধ্যে প্রথম দশ বৎসরে মুসলমানদের সংখ্যা ঈষৎ হ্রাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু তারপর ৪০ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে হিন্দু ও শিখদের সংখ্যা ঐ ৫০ বৎসরে দ্রুত হ্রাস হইয়াছে।



১৮৮১ সালে তাহাদের সংখ্যা ছিল লোকসংখ্যার শতকরা ৫২½ ভাগ, আর ১৯৩১ সালে তাহাদের সংখ্যা নামিয়াছে শতকরা ৪৬ ভাগে। অর্থাৎ ৫০ বৎসরের মধ্যে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে।



৩নং চিত্র—পাঞ্জাব

২নং চিত্রে হিন্দু ও শিখদের লোকসংখ্যা একত্র করিয়া দেখানো হইয়াছে। শিখদের সংখ্যা যদি পৃথকভাবে হিসাব করা যায়, তবে পাঞ্জাবে হিন্দুদের অবস্থা আরও শোচনীয় প্রতীয়মান হইবে। ৩নং চিত্রে শিখদের সংখ্যা পৃথকভাবে দেখানো হইল।

৩নং চিত্রে দেখা যাইবে যে, ১৮৮১ সালে শিখেরা পাঞ্জাবের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ ছিল, আর ১৯৩১ সালে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১৪ ভাগে। অর্থাৎ ৫০ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। সুতরাং পাঞ্জাবে শিখসম্প্রদায়কে বাদ দিলে, কেবলমাত্র হিন্দুদের সংখ্যা যে শোচনীয়রূপে হ্রাস হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

গত ৫০ বৎসরে পাঞ্জাব ও বাঙলায় হিন্দু ও মুসলমানের লোক-সংখ্যার এই হ্রাসবৃদ্ধি তুলনা করিয়া অধ্যাপক রুচিরাম সাহানী প্রশ্ন করিয়াছেন, এই পার্থক্যের কারণ কি? উভয় সম্প্রদায়ই একই দেশে, একই জলবায়ুতে পাশাপাশি বাস করিতেছে, রাজনৈতিক অবস্থাও উভয়েরই সমান। তৎসত্ত্বেও এরূপ বিপরীত অবস্থা হয় কেন? স্বভাবতঃই অনুমান করিতে হয়, হিন্দুদের সমাজব্যবস্থা এবং জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার ফলে তাহাদের লোকসংখ্যার ক্ষয় হইতেছে। পাঞ্জাব বাঙলার মত ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নহে। সুতরাং পাঞ্জাবের হিন্দুদের দুর্দ্দশা ম্যালেরিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু পাঞ্জাব ও বাঙলায় উভয়ত্রই হিন্দুদের সামাজিক অবস্থা, আচার, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি প্রায়ই একরূপ। অতএব এই সমস্তের মধ্যেই হিন্দুসমাজের ক্ষয়ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

অধ্যাপক রুচিরাম সাহানীর মতে হিন্দুসমাজের ক্ষয়ব্যাধির কারণগুলি এই :—(১) জাতিভেদ প্রথা এবং তজ্জনিত ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা। (২) বাল্যবিবাহ। (৩) হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহের অপ্রচলন, পক্ষান্তরে মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহে ও বহুবিবাহ প্রথার অপ্রচলন। (৪) হিন্দুরা সহজেই অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে এবং সেই সব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে যথাযোগ্য সম্মান পায়, পক্ষান্তরে অন্যধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করা পূর্ব্বে একেবারেই অসম্ভব ছিল, বর্ত্তমানে অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য। (৫) হিন্দুরা বেশীর ভাগ সহরে বাস করে, আর মুসলমানেরা বেশীর ভাগ গ্রামে মুক্ত বায়ুতে কৃষকজীবন যাপন করে। (৬) হিন্দুরা প্রধানতঃ নিরামিষাশী, আর মুসলমানেরা প্রধানতঃ মাংসাশী।

অধ্যাপক রুচিরাম সাহানী মনে করেন যে, এই সমস্ত কারণসমবায়েই হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যার হার ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। অধ্যাপক

সাহানীর কথাগুলি বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনার যোগ্য। বাঙলা-দেশের হিন্দুসমাজের মধ্যেও ঐ সব কারণ বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদের সমাজজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বাঙলাদেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যে আরও কতকগুলি আর্থিক ও সামাজিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া উহার সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে!

পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

বিশেষভাবে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা কেন এরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে এবং হিন্দুরা পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহা আমরা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সমগ্র লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা—১৯৩১

	হিন্দু	মুসলমান
সমগ্র বঙ্গ	৪৩	৫৪
পূর্ব্ববঙ্গ	২৭	৭১

পঞ্চাশ বৎসরে বৃদ্ধির হিসাব—শতকরা (১৮৮১-১৯৩১)

	হিন্দু	মুসলমান
সমগ্র বঙ্গ	২৩	৫১
পূর্ব্ববঙ্গ	৩৯	৮৭

প্রথমেই চোখে পড়ে নদীপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গের জমি উর্ব্বরা হওয়াতে এবং নূতন নূতন চর অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর স্থানে বসতি স্থাপন করাতে মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকের সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে।

আদমসুমারীর রিপোর্ট হইতে বাঙলা দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবটা একটু পরখ করিলে ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাইবে—

প্রতি বর্গমাইলে গড়ে কতজন লোক বাস করে

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৮৭২-১৯২১ খৃঃ পর্য্যন্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার
সমগ্র বঙ্গ	৪৩০	৪৮৪	৫২১	৫৬৩	৫৭৮	৬১৬	৩০·৭
পূর্ব্ববঙ্গ	৪০৫	৪৬৩	৫১৩	৫৭৭	৬২৫	৬৩৮	৫৭৫
পশ্চিম বঙ্গ	৪৩৪	৫৫৫	৫৯৫	৬১১	৫৮১	৬১৮	১৫·৭
উত্তর বঙ্গ	৪৪৪	৪৬৩	৪৮৯	৫২৮	৫৩৮	৫৫০	১৩·৯
মধ্যবঙ্গ	৪৭০	৪৮৯	৫১৫	৫৪১	৫৪৩	৫৬০	২০·৫

উপরোক্ত তথ্য হইতে দেখা যাইবে, বাঙলা দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী এবং পশ্চিম বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা কম। ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ত্রিপুরা রাজ্য লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ধরা হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৯৩জন লোকের বাস, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৩৪জনের, আর ঢাকা বিভাগে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৯৩৫জনের বাস। কেবলমাত্র ঢাকা বিভাগের হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে :—

ঢাকা বিভাগে প্রতি বর্গমাইলে কত লোক বাস করে

১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার
৫৮৬	৬৬২	৭২৬	৮০৯	৮৬৬	৯৩৫	৫৯·৫

পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে যেমন ঢাকাবিভাগেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ঢাকা বিভাগের মধ্যে আবার তেমনি ময়মনসিংহ জেলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন জেলা অপেক্ষা এই ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা বেশী। এমন-কি পৃথিবীর অনেক মাঝারি রকমের দেশ হইতে ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা বেশী। ময়মনসিংহ জেলায় প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১২৬৫জন লোক বাস করে এবং ১৮৮১—১৯৩১ এই ৫০ বৎসরে ইহার লোকসংখ্যা শতকরা ৬৮ ভাগ বাড়িয়াছে। ১৮৮১ সালে ময়মনসিংহে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫২জন লোক বাস করিত, আর ১৯৩১ সালে ঐ স্থানে বাস করিয়াছে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১২৬৫জন। এই অত্যধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হেতু কি? ময়মনসিংহ শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ নহে। কৃষিই ইহার প্রধান সম্বল। তন্মধ্যে পাটই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। সুতরাং বুঝা যাইতেছে কেবলমাত্র কৃষিসম্পদের উপর নির্ভর করিয়াই ময়মনসিংহের এই অত্যধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২১—১৯৩১ এই দশ বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় ৫ লক্ষ লোক আসামে গিয়া বসতি করিয়াছে। ঐ ৫ লক্ষের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার লোকই অধিকাংশ। এই সব আসামগামী লোক ধরিলে ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্ব্বোক্ত হিসাব অপেক্ষা আরও বেশী বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গে এবং বিশেষভাবে ঢাকা বিভাগে লোকসংখ্যা যে বেশী বাড়িতেছে, তাহার মধ্যে মুসলমানের অংশই বেশী। ময়মনসিংহ জেলার সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রিজলী সাহেবের হিসাবে জানা যায়, ১৮৫০—৫৪ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় ⅔ দুই তৃতীয়াংশ লোক ছিল হিন্দু এবং ⅓ এক-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান। কিন্তু ১৯৩১ সালের

আদমসুমারীর বিবরণে প্রকাশ, ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যার শতকরা ৭৬ ভাগ মুসলমান এবং মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ হিন্দু। অর্থাৎ ১৮৫০—১৯৩১ খৃঃ এই ৮১ বৎসরের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় হিন্দুর অনুপাত দুই-তৃতীয়াংশ বা শতকরা ৬৬ ভাগ হইতে শতকরা ২৩ ভাগ বা এক-চতুর্থাংশেরও কমে দাঁড়াইয়াছে, আর মুসলমান লোকসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৩৩ ভাগ হইতে শতকরা ৭৬ ভাগে উঠিয়া গিয়াছে।

৮১ বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র ময়মনসিংহ জেলাতে লোকসংখ্যায় হিন্দু-মুসলমানের অনুপাতে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বাঙলা দেশে হিন্দু জনসংখ্যার ক্ষয়ের কারণ ভালরূপে বুঝা যাইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম প্রধান জেলা ঢাকাতেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে।

Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Dacca, 1910-1917 by F. D. Ascoli—বইখানিতে এই সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আছে। ঐ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—"Of the total population of the district (1911 Census) 10,52.526 are Hindus and 18,93,470 are Mohamedans, but the large excess of the latter religion is of recent origin. In 1840 it was reported that the members of Hindus and Mohamedans were about equal, while the revenue survey statistics give their respective members as 4,45,182 and 4,49,223. In the Census of 1872, 3 Hindus were euumerated to every 4 Mohamedans ; the figures of 1911 give a proportion of 5 to 9 respectively. The increase of the Hindu population between 1872 and 1911 has been

only .87 per 100 annually, compared with a Mohamedan increase of 2.05 per 100. * * * * It may be roughly stated that the rate of natural increase of the Mohamedan population is double that of the Hindus. * * * It is interesting to note that the one-fourteenth of the Hindu population lives in the towns of Dacca and Narayangunj.

অর্থাৎ—"ঢাকা জেলায় মোট লোকসংখ্যার (১৯১১) মধ্যে ১০,২৫,৫২৬ জন হিন্দু এবং ১৮,৯৩,৪৭০ জন মুসলমান। কিন্তু মুসলমানের এই সংখ্যাধিক্য বেশী দিনের নহে। ১৮৪০ খৃঃ ঢাকা জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল বলিয়া জানা যায়। ঐ সময়ের রেভেনিউ সার্ভে ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ হইতে দেখা যায়, হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৪,৪৫,১৮২ এবং মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৪,৪৯,২২৩ জন। ১৮৭২ সালের আদম সুমারীতে এই জেলায় প্রতি ৪ জন মুসলমানের স্থলে ৩ জন হিন্দু গণনা করা হইয়াছিল। ১৯১১ সালের আদম সুমারীতে মুসলমান ও হিন্দুর অনুপাত দেখা যায় ৯:৫। ১৮৭২ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত হিন্দুদের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে বার্ষিক শতকরা ·৮৭ হিসাবে, আর মুসলমানদের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে বার্ষিক শতকরা ২·০৫ হিসাবে। মোটামুটি বলা যায়, হিন্দুদের বৃদ্ধির হার অপেক্ষা মুসলমানদের বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ।······ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঢাকা জেলার মোট হিন্দু জনসংখ্যার ১/১৪ ভাগই ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ সহরে বাস করে।"

আস্কলী সাহেব বলিয়াছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ এবং বিধবাবিবাহের সুপ্রচলন, চর অঞ্চল এবং বিল অঞ্চল প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া মুসলমান কৃষকদের নূতন বসতি স্থাপন—তাহাদের

দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ। আস্কলী সাহেবের মন্তব্যে একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ঢাকা জেলার সমগ্র হিন্দু জনসংখ্যার ১/১৪ অংশ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সহরেই বাস করে। অর্থাৎ হিন্দুদের একটা বড় অংশ গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; কেরাণী, চাপরাশী হইতে আরম্ভ করিয়া কলকারখানার শ্রমিক পর্য্যন্ত সবই ইহাদের মধ্যে আছে। গ্রামবাসী বহু হিন্দু কৃষক কৃষিবৃত্তি ছাড়িয়া এইভাবে সহরে নানা উপায়ে জীবিকা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইতেছে।

হিন্দুর জীবনী শক্তি হ্রাস

আমাদের মনে হয়, হিন্দুসমাজের শ্রমিক, কৃষক ও শিল্পী জাতিগুলির মধ্যে একটা কর্ম্মবিমুখতা, জীবনে ঔদাসীন্যের ভাব এবং Will to live বা বাঁচিবার ইচ্ছার অভাব প্রবেশ করিয়াছে। আর ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ তাহাদের মধ্যে spirit of adventure বা দুঃসাহসিকতার অভাব ঘটিয়াছে। যে Aggressiveness বা জিগীষু সবল মনোবৃত্তির জন্য মানুষ জীবনসংগ্রামে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারে, জীবনের যাত্রাপথে অবলীলাক্রমে নূতন নূতন পথ বাছিয়া লয়, বাঙলার হিন্দুদের মধ্যে তাহা লোপ পাইতেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে তাহা তুলনায় বেশী পরিমাণে আছে। সেই জন্যই দেখি, নূতন চরের জমিতে সাপ ও কুমীরের সঙ্গে লড়াই করিয়া মুসলমানেরা নূতন বসতি স্থাপন করে। সুন্দরবন অঞ্চলে জঙ্গল কাটিয়া বাঘের সঙ্গে তাল ঠুকিয়া তাহারাই গ্রাম গড়িয়া তোলে। আসামের জঙ্গল ও পাহাড়ে তাহারাই যাইয়া উপনিবেশন স্থাপন করে। জাহাজের লস্কর হইয়া উত্তাল

সমুদ্রবক্ষে তাহারাই পাড়ি দেয়। বাঙলার গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে এই দুঃসাহসিকতা—অজানা দুর্গম পথে যাত্রার সাহস আজ আর নাই। চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগরের বংশ লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গলার প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বজাতির গৌরব কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন—

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া
আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় সাপেরে খেলাই
নাগের মাথায় নাচি।

কিন্তু আজ বাঙ্গলার হিন্দুরা এই গৌরবের দাবী করিতে পারে কি? যে সব কৃষক, শ্রমিক ও শিল্পী হিন্দু গ্রামে বাস করে, তাহারা সাতপুরুষের ভিটা আঁকড়াইয়াই পড়িয়া থাকে। নূতন চর অঞ্চলে বা সুন্দরবনে যাইয়া নূতন গ্রাম পত্তন করিবার প্রবৃত্তি বা উদ্যম তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না বা সেজন্য ঝুঁকি লইতেও তাহারা প্রস্তুত নহে। বাঙলা ছাড়িয়া আসামের দুর্গম অরণ্যে গিয়া যাহারা উপনিবেশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও হিন্দুদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এমন কি, বাঙলার কোন প্রাচীন গ্রামে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুরা ঝোপঝোড় আবৃত এঁদো পুকুর ও ডোবাপরিপূর্ণ গ্রামের পুরাতন অংশে বাস করিতেছে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইলেও উহা ছাড়িয়া গ্রামের ফাঁকা মাঠে নূতন বসতি করিবার প্রবৃত্তি বা উদ্যম তাহাদের নাই। কিন্তু মুসলমানেরা ঐ ভাবে 'সাতপুরুষের ভিটার' মায়ায় আবদ্ধ থাকে না। তাহারা প্রয়োজন হইলে পুরাতন বসতি ছাড়িয়া স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে গিয়া নূতন বসতি গড়িতে দ্বিধা করে না।

বাঙলা দেশে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা যে দ্রুত

বাড়িয়া যাইতেছে, মুসলমানদের অধিকতর সাহসিকতা, aggressiveness বা জিগীষু সবল মনোবৃত্তি তাহার একটা প্রধান কারণ, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ইহার সঙ্গে বিবেচনা করিতে হইবে, মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা এবং বিধবাবিবাহের সুপ্রচলন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে, কোন নূতন চরে বা সুন্দরবনের জঙ্গল-কাটা জমিতে ৫।৬ ঘর মুসলমান গিয়া বসতি করিল। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের একাধিক স্ত্রী আছে, যে সমস্ত নারী বিধবা হইতেছে, তাহাদেরও শীঘ্রই পুনর্বিবাহ হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। ইহাদের যেসব ছেলেমেয়ে হইতেছে, তাহারাও বিবাহযোগ্য হইতেই অতি সহজেই পরস্পরের সহিত বিবাহিত হইতেছে। জাতিভেদের কোন বাধা নাই। ইহার সঙ্গে আরও বিবেচনা করিতে হইবে, মুসলমানদের মধ্যে কর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা নাই, কোন কার্য্যকেই তাহারা হীন মনে করে না। এই সমস্ত অবস্থা একত্র বিবেচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ঐ ৫।৬ ঘর মুসলমানের বংশ কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হইবে এবং নূতন গ্রামে ৪০।৫০ ঘর মুসলমানের বসতি সহজেই বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ইহা আমাদের কল্পনামাত্র নয়, বাস্তবক্ষেত্রে এইভাবেই বাঙলা দেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে।

আর একটা কারণ যে হিন্দুকৃষকের সংখ্যা হ্রাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ বিশেষভাবে বাঙলা দেশ কৃষিপ্রধান। এখনও অধিকাংশ লোক এদেশে গ্রামেই বাস করে এবং কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনধারণ করে। সেই কৃষিকার্য্যই যে ক্রমে হিন্দুদের হস্তচ্যুত হইতেছে এবং তাহারা ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছে, ইহা বাঙলার হিন্দুদের পক্ষে আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ। আরও দুর্লক্ষণের কথা, কৃষিকার্য্য কেবল হিন্দুদের হস্তচ্যুতই হইতেছে না, কৃষির প্রতি হিন্দুসাধারণের একটা

অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছে। 'লাঙ্গল ছুঁইলে অশুচি হয়' বাঙলার অনেক-স্থলে এমন কুসংস্কারের অস্তিত্বও দেখা যায়। 'ধরিত্রী মাতার' সঙ্গে বাঙলার গ্রামবাসীদের জীবনমরণ সম্বন্ধ, উহার সঙ্গে তাহাদের নাড়ীর টান, প্রাণের যোগ। বাঙলার হিন্দু যদি সেই 'ধরিত্রী মাতার' ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হয়, তবে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

যে-পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িতেছে, সেই পূর্ব্ববঙ্গেই পাশাপাশি একই গ্রামে বাস করিয়া হিন্দুদের সংখ্যা এত নিম্নহারে বাড়িতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে। ইহা হইতে কি মনে হয় না যে, মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের জীবনীশক্তি তথা প্রজননশক্তি অনেক কম? হিন্দুদের প্রজননশক্তি মুসলমানদের তুলনায় কম হওয়ার নানা কারণ থাকিতে পারে,—যথা—(১) হিন্দুরা প্রধানতঃ নিরামিষাশী, আর মুসলমানেরা প্রধানতঃ মাংসাশী; (২) হিন্দুরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অপেক্ষা বেশী অগ্রসর, আর শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে কম অগ্রসর অথচ সুস্থ, সবল, জীবনশক্তি বিশিষ্ট জাতির মধ্যে প্রজননশক্তি বেশী হয়; (৩) হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিকের সংখ্যা বেশী, আর এই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই যে প্রজনন শক্তি বেশী হয়, ইহাও সুপরিচিত তথ্য।

হিন্দুসমাজকে আজ এই সব তথ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার উপায় স্থির করিতে হইবে।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

বাঙলাদেশে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি প্রধান কারণ, বহু হিন্দুর মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ। পাঠান যুগ হইতেই এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও চলিতেছে। প্রধানত দুইটি কারণে হিন্দুর এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্ভবপর হইয়াছে। প্রথমত হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা, তাহার অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা। পূর্ব্বে কয়েকটি প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। বহু বৌদ্ধ এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধও যে হিন্দুসমাজের অত্যাচারে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাও আমরা বলিয়াছি। দ্বিতীয়ত, মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকদের প্রচারকার্য্য। প্রধানত নিম্নজাতীয় হিন্দুরাই এই প্রচারকার্য্যের ফলে মুসলমান হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। রিজলী সাহেব ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলমান হিন্দু সমাজের পোদ ও নমঃশূদ্র হইতে হইয়াছে। রিজলী সাহেবের এই মন্তব্যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যাহাদিগকে আমরা "অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়" করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা যে প্রথম সুযোগেই মুসলমান ধর্ম্মের সাম্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কৃত 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' (২য় সংস্করণ) কতকগুলি মূল্যবান তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে।

"একদিকে উপনিবেশ স্থাপন, অন্যদিকে ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান সাধুগণের উদার মত ও ধর্ম্মপ্রচারও মুসলমানাধিক্যের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শ্রীহট্টের মহাপুরুষ শাহ জালাল

৩৬০ জন আউলিয়া লইয়া আঁসিয়া শ্রীহট্টের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কেবল শ্রীহট্ট জেলার মধ্যেই যে ইঁহাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ক্রমশ ইঁহাদের দ্বারা ইসলাম ধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আছেন, তন্মধ্যে এই আউলিয়াগণের বংশীয়দের কোন না কোনভাবে সম্পর্ক নাই, এমন অতি অল্পই দেখা যায়। বিজয়ী মুসলমানদের ধর্ম্মে তখন বহু লোক দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দু জাতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, তৎকালে অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র বিপ্লবের যুগে, ধর্ম্মবন্ধন যে শিথিল হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।·····এই অবস্থায় সমাজের মধ্যে যাহাদের অবস্থা হীন ছিল, তাহারাই দলে দলে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বাদশাহী জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল।······শ্রীহট্টের শাহ জালালের ন্যায় বিক্রমপুরের বায়া আদম বা বাবা আদম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রভাবে সহজেই পূর্ব্ববঙ্গে ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তৃতিলাভ করে। নিম্নবর্ণের লোকেরা ইসলাম ধর্ম্মে নানাপ্রকার সাম্যভাব দেখিয়াও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।”

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র কৃত “যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে”ও লিখিত হইয়াছে যে, পাঠান আমলে বহু পীর, আউলিয়া প্রভৃতি গিয়া যশোহর ও খুলনার নানাস্থানে “আস্তানা” করেন। ইঁহাদের দ্বারা যে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারে খুবই সহায়তা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যশোহর জেলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ইহা অন্যতম কারণ। বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলেও সে সময়ে বহু পীর ও আউলিয়াদের আস্তানা হইয়াছিল এবং তাঁহারা ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। সেই কারণে

যাহারা পীর ও আউলিয়াদের নিকট ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা লইত না, তাহারাও ঐ সব মুসলমান সাধুদিগকে শ্রদ্ধা করিত। মুসলমান সাধু ও পীরদের এইরূপে বহু হিন্দু শিষ্যও জুটিয়া যাইত। ঐরূপ দৃষ্টান্ত এ যুগেও বিরল নহে। ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুদের এই অত্যধিক উদারতা, আদর্শের দিক দিয়া যতই উচ্চ হোক, কার্য্যক্ষেত্রে হিন্দুদের বহু ক্ষতি করিয়াছে, কিঞ্চিৎ অনুদার শুনাইলেও একথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। বর্ত্তমানকালে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রভৃতি এজন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্য্যের ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এখনও বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। বাঙলার গ্রামেও ঐ ব্যাপার চলিতেছে।

উত্তরবঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারের পশ্চাতে বহু সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ নিহিত আছে। "রংপুরে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে বুকানন সাহেব (১৮০৭) লিখিয়াছেন যে, এখানকার মুসলমানেরা আরব, আফগান বা মুসলমান আগন্তুকদের বংশধর নহে, অধিকাংশই স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের বংশধর, রাজা ও ভূস্বামীদের গোঁড়ামি ও অত্যাচারের ফলে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছে। রাজা রামমোহনের সময়েও এই ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন প্রবলভাবে চলিয়াছিল। রংপুর অপেক্ষা বগুড়া জেলায় আফগান জায়গীরদারদের ধর্ম্মপ্রচার অধিকতর ফলপ্রদ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকে অনেক আফগান করতোয়ার পশ্চিম তীরে দিনাজপুর হইতে ঘোড়াঘাট এমন কি নাটোরের নিকট পর্য্যন্ত নিষ্কর জমি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল করতোয়ার পূর্ব্বপারের কুচজাতির অভিযান ও আক্রমণ হইতে শান্তিস্থাপন এবং দেশরক্ষা করা। একদিকে যেমন তাহারা প্রজাদিগকে জোর করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে লাগিল, অপরদিকে তাহারা পূর্ব্ব অঞ্চলে সৈন্য অভিযান করিয়া

আদিম জাতিদের সম্মুখে' একহস্তে তরবার অন্য হস্তে কোরাণ লইয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ ব্যাপার প্রায় দুইশত বৎসর চলিতে থাকে। তুঘ্রিল খাঁর আক্রমণ (১২৫৭) ও হুসেন সাহের কামতাপুর ধ্বংসবিধান (১৪৯০) ইহার সাক্ষ্য দেয়। অপরদিকে কুচবিহারের রাজা বিষ্ণু সিংহ (১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) যখন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করিলেন, তখন ঐ অঞ্চলের অনেক উচ্চশ্রেণীই তাঁহার অনুকরণে হিন্দু হইল। অবশিষ্ট কুচ, মেচ, বোদো, ধীমলি প্রভৃতি নিম্নজাতির লোকেরা হিন্দু-সমাজের বাহিরে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত থাকিয়া গেল। তখন তাহাদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।······বগুড়া যে বাংলার সব জেলা অপেক্ষা মুসলমানবহুল, তাহার প্রধান কারণ বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের এক করুণ বিস্মৃত অধ্যায়ে নিহিত রহিয়াছে।" *

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সহস্র সহস্র হিন্দু প্রাচীনকাল হইতে সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিকের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু মধ্যযুগে হিন্দুশাস্ত্রে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হওয়াতে উহারা দলে দলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেই জন্যই মুসলমানের সংখ্যা বেশী এবং জাহাজের লস্কর, সারেং প্রভৃতির কাজ যাহারা করে, তাহারা সকলেই মুসলমান। মালাবারেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটে। †

মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টান ধর্ম্মও হিন্দুদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে, এখনও চালাইতেছে। খৃষ্টান মিশনারীরা দক্ষিণ ভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক খৃষ্টান করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙলাদেশেও তাঁহারা নানাভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়া কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। প্রথমত. বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া

---

* 'বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী'—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

† পরিশিষ্টে "ডাঃ মুঞ্জে ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের দুর্গতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাঁহারা খৃষ্টানধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপায়ে পূর্ব্বে তাঁহারা বহু হিন্দু যুবককে খৃষ্টান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে গ্রাম অঞ্চলে নানা সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াও খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য মিশনারীরা চালাইয়া থাকেন। যশোর, নদীয়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় খৃষ্টান মিশনারীদের এইরূপ প্রচারমুখী সেবাপ্রতিষ্ঠান আছে। খৃষ্টান মিশনগুলির অর্থবল ও জনবল উভয়ই প্রচুর পরিমাণে আছে।

একদিকে খৃষ্টান ধর্ম্ম ও অন্যদিকে মুসলমান ধর্ম্ম—এই দুই প্রচারশীল ধর্ম্মের সম্মুখীন হইয়া হিন্দুসমাজকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম্ম মোটেই প্রচারশীল ধর্ম্ম নহে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে দীক্ষা দিয়া সে হিন্দু করিয়া লইতে সম্মত নহে। সে কেবল লোককে সামান্য ভুলত্রুটির জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিতেই জানে, বাহির হইতে কাহাকেও গ্রহণ করিতে জানে না। ইহার ফলে হিন্দুসমাজ আজ কবির ভাষায় সত্যই “অচলায়তন” হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রথমে অ-হিন্দুদিগকেও দীক্ষা দিয়া হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। বহু পাহাড়িয়া জাতি এই সময়ে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মণিপুর পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণ গোস্বামীরা আসিয়া এই উদারতার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। নতুবা এতদিনে বাঙলার প্রান্তভাগের বহু পাহাড়িয়া ও অহিন্দু জাতি হিন্দু হইয়া যাইত। বর্ত্তমান যুগে আর্য্য সমাজীরা শুদ্ধি আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া ‘অচলায়তন’ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সম্মুখে একটা নূতন সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। যদি হিন্দুসমাজ এই শুদ্ধি আন্দোলনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে, তবে উহার দ্বারা হিন্দুসমাজের বহু সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু এদিকেও সেই সনাতনী

জাতিভেদের মনোবৃত্তি প্রবল বাধা হইয়া আছে। অ-হিন্দুরা যদি হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে হিন্দুসমাজে তাহাদের স্থান কোথায় হইবে? কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহারা হইবে? তাহাদের জন্য কি নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু সমাজের সনাতনী অনুদারতার ফলে অ-হিন্দুরা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে সম্মানের আসন পায় নাই, বরং তাহাদের জন্য একটা পৃথক "জাতবৈষ্ণবের" সৃষ্টি হইয়াছিল। শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে যাহারা হিন্দু হইতেছে, তাহাদের দশাও ঐরূপ হইতেছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আর্য্যসমাজের শুদ্ধি আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে বাঙলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মনে এই শুদ্ধিসমস্যার কথা উদিত হইয়াছিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে হিন্দুর সংখ্যা যে হ্রাস হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হ্রাস হওয়ার আশঙ্কা আছে, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই বিপত্তি নিবারণের জন্য শুদ্ধির ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার এক শত জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলিকাতার "পতিতোদ্ধার সভার অনুমত্যনুসারে" "পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা" প্রচার করেন। উহাতে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, শুদ্ধিব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত এবং যাহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দু হইতে ইচ্ছা করিলে, তাহাদিগকে শুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত পুস্তিকার শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আবেগপূর্ণ ভাষায় হিন্দুসমাজের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন,—"সুবিজ্ঞবর মহাশয়েরা উদিত বিষয় অতি মনোযোগপূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া, বর্ত্তমান সময়কে শেষ সাবকাশ জানিয়া, হিন্দুজাতির চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় ত্বরায় করিতে আদেশ হয়, যদ্দ্বারা পৃথিবী এককালে হিন্দুশূন্যভূতা ও

বেদবিহিত সনাতনধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয়; অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাঁহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ী সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতির সহিত ব্যবহার করণ সর্ব্বসাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন।" *

কিন্তু হায় ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার উদার দূরদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা হিন্দুসমাজকে আত্মরক্ষার জন্য যে আহ্বান করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ এখনও তাহাতে সাড়া দিতে পারিল না!

আর্থিক বিপর্য্যয়

হিন্দুসমাজের এই ক্ষয়রোগের মূলে যে সব আর্থিক ও জৈবনিক (Economical and Biological) কারণ নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। জাতিভেদের সমর্থকগণ উহার সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই যে, ইহার ফলে হিন্দুসমাজে আর্থিক সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হইয়াছিল। হিন্দুসমাজ যে এই ৩।৪ হাজার বৎসর ধরিয়া টিকিয়া আছে, তাহা জাতিভেদ ব্যবস্থার গুণেই সম্ভব হইয়াছে। বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কর্ম্মবিভাগের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং উহাকে বংশগত করিয়া দিয়াছিল। উহার ফলে অন্নসমস্যা লইয়া তীব্র প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দূর হইয়াছিল। অন্যান্য দেশে যেভাবে বেকার সমস্যা প্রবল হইয়া সমাজের শান্তি নষ্ট হইয়াছে, এমন কি কোন কোন স্থলে তাহার ফলে জাতি ও সমাজ ধ্বংস হইয়াছে, বংশগত কর্ম্মবিভাগের জন্য হিন্দুসমাজে সেই সব অনর্থের

* "হিন্দুর সংখ্যা সংরক্ষণের চেষ্টা"—অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার।

সৃষ্টি হয় নাই। ইহাকে এক হিসাবে Practical Socialism বা কার্য্যকরী সমাজতন্ত্রবাদও বলা যাইতে পারে। এই প্র্যাক্‌টিকাল সমাজতন্ত্রবাদই এতকাল ধরিয়া সুদৃঢ় দুর্গের মত হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা সেই ব্যবস্থা লোপ করিয়া দিই, তবে হিন্দুসমাজের পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে।

জাতিভেদের সমর্থকদের এই যুক্তি শুনিতে আপাতত বেশ সমীচীন মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক এবং জীব-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কষ্টিপাথরে ইহা টিকিতে পারে না। বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থা অন্ততঃপক্ষে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন এই ব্যবস্থায় হিন্দুসমাজের আর্থিক সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হইয়াছিল, ইহা আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি। তখন হিন্দুজাতি সংখ্যায় অল্প ছিল, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে নানারূপ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই, দেশে প্রাকৃতিক সম্পদেরও অভাব ছিল না। সুতরাং বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদমূলক ব্যবস্থায় কতকটা নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দভাবেই জীবনযাত্রা চলিত।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগেও ঐ প্রাচীন ব্যবস্থা হিন্দুসমাজের পক্ষে উপযোগী কিনা এবং ইহার দ্বারা আমাদের আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে কিনা ইহাই প্রশ্ন। হইতে যে পারে না, তাহা কতকগুলি কল্পনাবিলাসী গোঁড়া সনাতনী ব্যতীত আর কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, তিন হাজার বৎসরের এই প্রাচীন ব্যবস্থা আমাদের সমাজকে আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না, বরং উহাই ধ্বংসের কারণ হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। উহার উপযোগিতা অন্তত সাতশত বৎসর পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছে। তবু বনিয়াদী বংশের জীর্ণ ফাটলধরা অট্টালিকার ন্যায় উহার অস্তিত্ব কোনরূপে টিকিয়া আছে। আমরা উহাকে সম্পূর্ণ

ত্যাগ করিতেও পারিতেছি না, উহার স্থলে নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সাহস ও ক্ষমতাও আমাদের নাই।

পাঠান ও মোগল যুগে জাতিভেদ বাহিরের আঘাত হইতে যদিও বা কোনরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু এই ব্রিটিশ যুগে উহা একেবারেই অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। এই যুগে একাধিক শক্তিমান পাশ্চাত্য জাতির মধ্য দিয়া আমরা বহির্জ্জগতের সঙ্ঘর্ষ ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছি। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদিগকে লড়াই করিতে হইতেছে। পাশ্চাত্য শিল্প বাণিজ্য বিজয়ীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে আসিয়া হানা দিয়াছে। উহার ফলে যে সব জটিল আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্মুখে আমরা বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি।

পাশ্চাত্য যান্ত্রিক শিল্প ও সভ্যতার আক্রমণের প্রথম ফল আমাদের নিজস্ব শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংস। হিন্দু সমাজের উপরই এই আঘাতটা প্রচণ্ড বেগে পড়িয়াছে। আমাদের নিজস্ব শিল্পের সমস্তই ছিল পল্লী-শিল্প ও কুটীর-শিল্প। হিন্দুসমাজের এক একটা জাতি বংশানুক্রমে এই সব শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক শিল্পের অভিযানে পরাস্ত হইয়া তাহারা অতি দ্রুত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। তন্তুবায়, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুমার, শাঁখারী, সূত্রধর, পাটনী—আর কত নাম করিব—সকলেরই প্রায় একই অবস্থা। কেবলমাত্র বস্ত্রশিল্প ও তন্তুবায় জাতির অবস্থা ভাবিলেই বুঝা যাইবে, আমাদের সমাজে কি ঘোর আর্থিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কেন আমরা দিন দিন ক্ষয় পাইতেছি। ইংরেজাধিকারের প্রাক্কালে একমাত্র বাঙলা দেশের তাঁতিরাই এত বস্ত্র তৈরি করিত যে, তাহা সমগ্র বাঙলা দেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী

হইত। কিন্তু বিদেশী বস্ত্রশিল্প হিন্দু তাঁতিকে বৃত্তিহীন করিয়াছে। অন্যান্য দেশীয় শিল্প সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য যান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে হিন্দুসমাজের যেসব জাতির কৌলিক বৃত্তি লোপ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের পরিণাম আমরা তো চোখের উপর দেখিতেছি। প্রথমত, তাহারা উপায়ান্তর রহিত হইয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে থাকে। ফলে একদিকে যেমন বিবিধ পল্লীশিল্পে নিযুক্ত হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু কৃষকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং শেষভাগে হিন্দু কৃষকের সংখ্যা এইভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ অবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে নাই প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমত, বৃত্তিহীন শিল্পী জাতিরা নিরুপায় হইয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করাতে জমির উপর চাপ বাড়িয়া গেল এবং তাহার অপরিহার্য্য পরিণাম কৃষকদের সাধারণ আয় কমিয়া গেল, তাহারা অধিকতর দরিদ্র হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া যাহারা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা ক্রমে অন্য বৃত্তি অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং বৃত্তির অভাবে বেকারের দল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। দ্বিতীয়ত, যাহারা বংশানুক্রমে কোন শিল্পবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা হঠাৎ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, উহার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। বংশানুক্রমিক বা কৌলিক বৃত্তিতে যে পটুতা তাহাদের ছিল, কৃষিকার্য্যে সেইরূপ পটুতা তাহাদের হইতে পারে না। জাতিভেদের সমর্থকগণ বলিয়া থাকেন যে, বৃত্তি বংশগত হওয়ার একটা সুফল এই যে, বিভিন্ন জাতি স্ব স্ব বৃত্তিতে খুবই উৎকর্ষলাভ করে। সেইজন্যই হিন্দু শিল্পীরা শিল্পকলায় অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

কিন্তু ইহার অপর একটা দিক যে আছে, জাতিভেদের সমর্থকগণ তাহা ভাবিয়া দেখেন না। এই বংশগত বৃত্তিব্যবস্থার ফলে ঐ সব বৃত্তিজীবীর বংশধরদের মধ্যে একটা স্থিতিশীলতা আসিয়া পড়ে, তাহারা নূতন অবস্থার সঙ্গে সহজে নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারে না। যেসব সমাজে বংশগত বৃত্তির ব্যবস্থা নাই, সেখানে একই বংশের লোকেরা সহজেই বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, তাহাতে সাফল্যও লাভ করে। কিন্তু আমাদের এই বংশগত বৃত্তির দেশে সেরূপ হওয়া সহজে সম্ভবপর নহে। এই অন্তর্নিহিত কারণের ফলে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যেসব হিন্দু কৌলিক বৃত্তি ছাড়িয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। গত ৪০।৫০ বৎসর হইতে হিন্দু কৃষকের সংখ্যা বাঙলা দেশে হ্রাস হইতেছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। মুসলমানদের সংখ্যা যেমন দ্রুতবেগে বাড়িতেছে, তেমনি তাহারা সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের পরিত্যক্ত কৃষিবৃত্তি লুফিয়া লইতেছে। বাঙলায় বিশেষত পূর্ব্ববঙ্গের অনেক গ্রামে হিন্দু কৃষক নাই বলিলেই হয়। মুসলমানেরাই ভাগচাষী বা বর্গাদার হিসাবে হিন্দু কৃষকদের জমি চাষ করিতেছে। হিন্দুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়া দাঁড়াইয়াছে মধ্যস্বত্বভোগী। গ্রামবাসী হিন্দুদের পক্ষে ইহা যে কত বড় আর্থিক বিপর্য্যয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এদিকে জমি সম্বন্ধে যে সব নূতন আইন হইতেছে, তাহার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। একদিকে কৌলিক বৃত্তি লোপ, অন্যদিকে কৃষিবৃত্তি হইতে অপসারণ, এমন কি জমির স্বত্ব লোপ, এই সমস্ত মিলিয়া গ্রামবাসী হিন্দুর অবস্থা আজ দুর্দ্দশার চরমে উঠিয়াছে। ইহার ফলে গ্রামবাসী হিন্দুরা যে ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকিবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

গ্রামবাসী হিন্দু কৃষকদের মধ্যে যাহারা কৃষিবৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের বংশধরদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু লেখাপড়া শিখিয়া মফঃস্বল সহর বা কলিকাতায় আসিয়া কেরাণী, পিয়ন, চাপরাশী, গোমস্তা প্রভৃতির কাজ করিতেছে,—কেহ কেহ বা কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ করিতেছে। কিন্তু এই উভয়ক্ষেত্রেই হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, মাদ্রাজীদের সঙ্গে তাহাদিগকে আজকাল প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রতিযোগিতায় বাঙালী হিন্দুরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতেছে। হিন্দুসমাজে যে আর্থিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা তাহার আর একটা শোচনীয় দিক। ভূমিহীন, কর্ম্মহীন, বেকার হিন্দুর সংখ্যা এইভাবে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং হিন্দুর সমাজজীবনের উপর তাহার ঘোর অনিষ্টকর প্রভাব দেখা যাইতেছে।

হিন্দুদের মধ্যে যে যৌথপরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা বর্ত্তমান যুগের সঙ্ঘর্ষে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। হিন্দু সমাজের আর্থিকবিপর্য্যয়ের মূলে ইহাও কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। যৌথ পরিবার প্রথার একটা ভাল দিক ছিল। উহা হিন্দুসমাজের মূলে সঙ্ঘশক্তির প্রেরণা যোগাইত, কিন্তু বর্ত্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে ঐ মধ্যযুগীয় প্রথা আর টিকিতে পারে না। অথচ এই পুরাতন যৌথপরিবার প্রথার স্থানে হিন্দু-সমাজ আত্মরক্ষার জন্য নূতন কোন কার্য্যকরী প্রথা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশসমূহে সঙ্ঘজীবন নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে,—কম্যুনিজম, সোসিয়ালিজম প্রভৃতি তাহারই নিদর্শন। হিন্দুসমাজ তাহার প্রাচীন সঙ্ঘজীবন ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নবযুগের সঙ্ঘজীবনের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, ইহা হিন্দু-সমাজের পক্ষে একটা মর্ম্মান্তিক সমস্যা।

নিম্নজাতির ক্ষয়

বাঙলার হিন্দুসমাজের ক্ষয়ের একটা প্রধান কারণ যে, নিম্নজাতিদের সংখ্যাহ্রাস এবং বংশলোপ—তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, অন্ততপক্ষে পারা উচিত। বাঙলার হিন্দুসমাজে তথাকথিত উচ্চজাতিরা, অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি কয়েকটি জাতি মোট শতকরা কুড়ি ভাগ হইতে পঁচিশ ভাগের বেশী নহে। অবশিষ্ট শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগই তথাকথিত নিম্নজাতীয় হিন্দু। সুতরাং এই নিম্নজাতীয় হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা ও জনবলের উপরেই যে হিন্দুসমাজের উন্নতি-অবনতি, শক্তি-সমৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বাঙলার হিন্দুসমাজের নিম্নজাতীয় হিন্দুদের বংশলোপ হইতেছে, প্রধানত তিনটি কারণে:—বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ এবং বিধবাবিবাহের অপ্রচলন। উচ্চজাতীয় হিন্দুদের অর্থাৎ যাহাদের আমরা সাধারণত "ভদ্রলোক সম্প্রদায়" বলি—তাহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে নিম্নজাতীয়দের সমস্যার কিছু প্রভেদ আছে। এই ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বরপণ' প্রচলিত (বংশজ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী ছাড়া) এবং বাল্যবিবাহ প্রথা গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। তাহাদের মধ্যে যথাসময়ে মেয়ের বিবাহ দেওয়াই একটা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ২০।২৫ বৎসর বয়সের মেয়েদেরও বয়স গোপন করিয়া বিবাহ দিতে হয়, ইহা আমরা সকলেই জানি। 'বরপণ' প্রথা এই সমস্যাকে আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। গত ৩০।১০ বৎসর ধরিয়া ভদ্রলোক হিন্দুরা 'বরপণের' বিরুদ্ধে বহু বক্তৃতা করিয়াছেন, প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, পণপ্রথা

নিবারণী সমিতি করিয়া বহু ভাবী বরের এবং তাহাদের পিতাদের 'প্রতিজ্ঞাপত্রে' স্বাক্ষর লইয়াছেন, নামজাদা নাট্যকারেরা নাটক লিখিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে এই 'কু-প্রথার' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন ; প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকেরা এই বরপণ সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া হৃদয়বিদারক উপন্যাস লিখিয়াছেন, এমন কি, স্নেহলতা হইতে আরম্ভ করিয়া আরও কয়েকজন হতভাগিনী কুমারী পিতামাতাকে বরপণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন ; কিন্তু তথাপি এই জঘন্য প্রথা দূর হয় নাই, বরং উহা উত্তরোত্তর যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, অর্থনীতি শাস্ত্রে যে Law of Demand and Supply, অর্থাৎ 'চাহিদা ও যোগানের' নিয়ম আছে, এখানেও সেই নিয়মই কার্য্য করিতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের প্রায় সকল পিতা-মাতাই চাহেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত বি-এ, এম-এ, পাশ করা সরকারী চাকুরিয়া অথবা হবু-চাকুরিয়া জামাই। অন্ততপক্ষে উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক অথবা হবু-উকীল প্রভৃতি হইলেও চলে। কিন্তু এই শ্রেণীর ছেলের সংখ্যা খুব বেশী নহে, তার উপর জাতিভেদ এবং অসবর্ণ বিবাহের অপ্রচলন সেই সংখ্যা সমস্যাকে আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। ফলে বিবাহের বাজারে এই শ্রেণীর "শিক্ষিত" বরের দাম ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্ত্তমানে বিয়ের বাজারে "আই-সি-এস" বরের মূল্য তিরিশ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা,—ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতির দর দশ হাজার হইতে পনের হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এটর্ণী, উকীল, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার এবং বিলাতফেরত অন্যান্য শ্রেণীর বরের মূল্যও আট দশ হাজার টাকার কম নহে। সুতরাং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পক্ষে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আর বিচিত্র কি! সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা যতদিন ধনীদের অনুকরণে এবং তাহাদের সঙ্গে

পাল্লা দিয়া এই বিশেষ শ্রেণীর "বর" খুঁজিবে, ততদিন বরপণ সমস্যার সমাধান হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

তবে ভবিষ্যতে কয়েকটি কারণে এই বরপণ সমস্যার জটিলতা হ্রাস হইতে পারে। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম-এ পাশ করা ছেলেদের এবং উকীল, ডাক্তার প্রভৃতির অর্থোপার্জ্জনের অক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের দুর্দ্দশা চোখের উপর দেখিয়া মেয়ের বাপদের এই শ্রেণীর ছেলেদের উপর ঝোঁক কমিতে পারে। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের বেশী বয়সে বিবাহ হইতেছে, তাহারা ছেলেদের মতই লেখাপড়াও শিখিতেছে। সুতরাং "বর মনোনয়ন" ব্যাপারে মেয়েদের মতামত অনেকক্ষেত্রে লইতে হইতেছে। আর অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম "শিক্ষিত ছেলেদের" এই সব মেয়েরা ভবিষ্যতে পছন্দ করিবে কি না সন্দেহ। তৃতীয়ত, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা "পরস্পরকে ভালবাসিয়া" বিবাহ করিতেছে এবং এরূপ বিবাহ প্রায়ই 'অসবর্ণ' হইতেছে। ভবিষ্যতে এরূপ বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, এ সব ক্ষেত্রে বরপণ সমস্যার প্রশ্ন উঠিবে না।

সে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে এই "বরপণ সমস্যার" জন্য মধ্যবিত্ত ভদ্র-লোকদের মধ্যে অনেক বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের অনূঢ়া থাকিতে হইতেছে। ছেলেরাও এই আর্থিক সমস্যারদিনে অনেক সময় ৩৫।৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতেছে। ইহার ফল মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন-দিক দিয়াই কল্যাণকর হইতেছে না। নানা কারণে বাল্যবিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে স্বীকার করি; কিন্তু ছেলেমেয়েরা যদি ৩০।৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে, তবে তাহার পরিণামও ভাল হইতে পারে না। উহার ফলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হয়, এমন কি, বংশলোপের

সম্ভাবনাও দেখা দেয়। উচ্চজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে জনসংখ্যা হ্রাসের ইহা একটি প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিম্নজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ইহাদের মধ্যে "কন্যাপণ" প্রথাই প্রচলিত, অর্থাৎ মূল্য দিয়া কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে হয়। বাল্যবিবাহও ইহাদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। তিন চার বৎসরের মেয়েরও বিবাহ হয়। সারদা আইন ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই এবং যে-আকারে ঐ আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোনদিন নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্য হইতে যে বাল্যবিবাহ দূর হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এই সব নিম্নজাতিদের মধ্যে কোন এক অজ্ঞাত "জৈবনিক" (Biological) কারণে কন্যার সংখ্যা সাধারণত খুব কম হওয়াতে সমস্যা আরও ঘোরালো হইয়াছে। মোটের উপর ফল দাঁড়াইতেছে এই যে, নিম্নজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই অর্থের অভাবে "কন্যাপণ" দিয়া বেশী বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেই পারে না। বহু বৎসর ধরিয়া সেজন্য তাহাদিগকে অর্থসঞ্চয় করিতে হয়। অবশেষে প্রৌঢ় বয়সে কিছু অর্থসঞ্চয় করিয়া তাহারা বিবাহ করে। কিন্তু কন্যার বয়স যত বেশী হয়, তত বেশী পণ দিতে হয়। সুতরাং যাহারা বেশী কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না, তাহাদের বাধ্য হইয়া অল্পবয়সের মেয়েকেই বিবাহ করিতে হয়। ৪৫।৫০ বৎসরের প্রৌঢ় ব্যক্তি চার-পাঁচ বৎসরের একটি মেয়েকে বিবাহ করিতেছে,—এদৃশ্য গ্রাম অঞ্চলের নিম্ন-জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। ইহার পরিণাম বড়ই শোচনীয়। সেই বালিকা পত্নী যুবতী হইবার পূর্ব্বেই হয়ত বৃদ্ধ স্বামী ভবলীলা সম্বরণ করে। রাখিয়া যায় একটি নিঃসন্তানা বালবিধবা। একদিকে বৃদ্ধের বংশলোপ হয়, অন্যদিকে অরক্ষিতা যুবতীবিধবা সমাজের পক্ষে একটা জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। যদি বিধবা বিবাহের সুপ্রচলন থাকিত, তবে

এই সমস্যার একটা সমাধান হইত। কিন্তু তাহা না থাকাতে ইহারা সমাজে দুর্নীতি ও ব্যভিচারের বিস্তারেই সহায়তা করে।

আমরা যে সব কথা বলিতেছি, তাহা অনেকের নিকট অপ্রিয় বোধ হইবে জানি। কিন্তু যতই অপ্রিয় হৌক, হিন্দুসমাজের কল্যাণের জন্য ইহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। হিন্দুসমাজের নিম্ন-জাতিরা যে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহার জন্য বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ এবং পুরুষদের বিবাহের অক্ষমতাই প্রধানত দায়ী। আমাদের জীবনের মধ্যেই পল্লী অঞ্চলে চোখের উপরে বহু জাতিকে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে দেখিয়াছি। বহু গ্রামে ধোপা, ভুঁইমালী, বেহারা, ধীবর, নাপিত, কুমার, তেলী, সূত্রধর, পাটনী প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে সব গ্রামে এই সব জাতীয় লোক এখনও আছে—সেখানেও তাহাদের বংশে বালকবালিকার সংখ্যা কম। বয়স্ক লোকদের সংখ্যাই বেশী। অর্থাৎ ৪০।৪৫ বৎসর পরে উহাদের সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত বংশে বাতি দিতে হয়ত কেহই থাকিবে না।

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী" গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে নিম্নজাতিদের সংখ্যা বাড়িতেছে, আর উচ্চজাতিদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মাহিষ্য, রাজবংশী ও নমঃশূদ্রদের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মাহিষ্য, রাজবংশী ও নমঃশূদ্র এই তিনটী জাতির সংখ্যা কিছু বাড়িতেছে বটে, বোধ হয় এখনও ইহাদের হাতে কৃষিকার্য্য আছে বলিয়া; কিন্তু এই তিনটী জাতি ছাড়া হিন্দু সমাজের অন্য সমস্ত নিম্নজাতির সংখ্যা কমিতেছে। এমন কি কোন কোন নিম্নজাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বেহারা, ধোপা, নাপিত, কুমার, মালী, ঝল্লমল্ল,

ক্ষত্রিয়, কোচ, তিয়র, হদি, হাজং, লুপ্ত মাহিষ্য (পাটনী), হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালী, মুচি, রহিদাস (চর্ম্মকার), জালিয়া, কাওরা, লোহার প্রভৃতি জাতিগুলির জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস হইতেছে। ১৯২১ সাল ও ১৯৩১ সাল এই দুইটী আদমসুমারীর লোকসংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যাইবে, ইহাদের বংশ লোপ আসন্ন।

উচ্চজাতীয় ভদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সমস্যার কথাই চিন্তা করেন। তাঁহাদের যত কিছু সংস্কারবুদ্ধি সবই নিজেদের কেন্দ্র করিয়া। তাহাই অবশ্য স্বাভাবিক; কিন্তু ইহাও ঠিক যে, এই সব নিম্নজাতীয়দের সমস্যা লইয়া যদি "শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা" চিন্তা না করেন এবং প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, তবে সমগ্রভাবে হিন্দুসমাজের ক্ষয় নিবারণ করা যাইবে না।

আমি বাঙলা দেশের যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর ও পাবনা জেলার কতকগুলি গ্রামের কথা জানি। সেখানে অ-বাঙালী হিন্দু বেহারা, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি আসিয়া বাঙালী হিন্দুর স্থান পূরণ করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলা হিন্দু সম্মেলনে সভাপতি এবং পাবনা জেলা হিন্দু সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেখাইয়াছেন যে, ঐ দুই জেলার গ্রামসমূহে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ক্রমশ লুপ্ত হইতেছে। বাঙলার মফঃস্বলের অনেক খেয়াঘাট হিন্দুস্থানীরা দখল করিয়া ফেলিয়াছে। সেজন্য কেবল ব্যবসাদার হিন্দুস্থানীদের দোষ দিয়া লাভ নাই। বাঙালী পাটনী যদি না পাওয়া যায়, তবে ভিন্ন প্রদেশাগত লোকেরাই সেই কাজের ভার গ্রহণ করিবে। বাঙলার উচ্চ জাতীয় ভদ্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে যদি নিম্নজাতীয় হিন্দুদের যোগসূত্র থাকিত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না।

বিধবাবিবাহ নিষেধের পরিণাম

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধবাবিবাহের অপ্রচলন হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। বিধবাবিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত, পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সে সম্পর্কে নূতন করিয়া তর্ক উত্থাপন করা অনাবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইনসম্মতও হইয়াছে। সুতরাং বিধবাবিবাহ দিবার পক্ষে কি শাস্ত্র, কি আইন—কোনদিক দিয়াই আজ আর বাধা নাই। তৎসত্ত্বেও দেশাচার ও লোকাচারের বাধা এমনই প্রবল যে, বিধবা বিবাহ এখনও পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে সুপ্রচলিত হইতে পারে নাই। বিদ্যা-সাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ওআইনসঙ্গত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই;—তিনি সমাজে উহা প্রচলন করিবার জন্য জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেজন্য বহু ত্যাগস্বীকার এবং নিন্দাগ্লানি সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তখনকার দিনের গোঁড়ারা বিধবাবিবাহ আন্দোলন করিবার জন্য তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল "বিদ্যার সাগর" বা "দয়ার সাগর" ছিলেন না, তিনি হিমালয়তুল্য কঠিন বীর্য্যবান মহাপুরুষ ছিলেন। কোন কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। তথাপি সমাজের জড়ত্বের উপর পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়াও তিনি তাহাকে সম্যক্ সচেতন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহ কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত হইলেও ফল এখনও আশানুরূপ হয় নাই।

বিধবাবিবাহ যে হিন্দুসমাজে এককালে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং আরও অনেকে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে ভারতের সকল প্রদেশেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেন হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু কি প্রাচীনকালে, কি বর্ত্তমান যুগে ভারতের কোন প্রদেশেই হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় নাই। "সাগাই" বিবাহ, "দ্বিতীয়" বিবাহ প্রভৃতি নানা নামে ইহার প্রচলন এখনও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেশেও নিম্নবর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন যে ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল—এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ আছে। সম্ভবত সর্ব্ববিষয়ে উচ্চবর্ণীয়দের "সদাচার" অনুকরণ করিতে গিয়া বাঙলাদেশের 'নিম্ন জাতীয়েরা' বিধবাবিবাহ বর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু "বৈধভাবে" বিধবাবিবাহ বর্জ্জিত হইলেও "অবৈধ-ভাবে" উহা এখনও চলিতেছে। বাঙলার পল্লীতে নিম্নজাতির পুরুষেরা বিবাহ করিতে না পারিলে বা বিপত্নীক হইলে প্রকাশ্যভাবেই কোন স্বজাতীয়া বিধবাকে গৃহে "রাখে"—অর্থাৎ তাহার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপন করে। ইহাতে সমাজে তাহাদিগকে নিন্দাভাগী বা জাতিচ্যুত হইতে হয় না। তবে এইরূপ "বে-আইনী" বিধবাবিবাহের ফলে সন্তানাদি হইলে সমস্যার সৃষ্টি হয় বটে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে সন্তানজন্মে বাধা দিবার জন্য চেষ্টার অভাব হয় না। ইহার পরিণাম যে অনেক সময় শোচনীয় হইয়া উঠে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি প্রধানতঃ বালবিধবাদের দুঃখদুর্দ্দশায় বিচলিত হইয়াই ঐ কার্য্যে

ব্রতী হইয়াছিলেন। তৎকালে হিন্দুসমাজের সকল স্তরে বাল্যবিবাহ সমধিক প্রচলিত থাকাতে বালবিধবার সংখ্যাও অধিক ছিল। এমন কি ১ বৎসর হইতে ৫ বৎসর বয়সের বিধবার সংখ্যাও কম ছিল না। একালেও যে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইয়াছে তাহা নহে। আদমসুমারীর রিপোর্ট খুঁজিলেই দেখা যাইবে, হিন্দুসমাজে ১ বৎসর হইতে ৫ বৎসর বয়সের বিধবা এখনও আছে, বিশেষত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে। দয়ার সাগর বিদ্যা-সাগর মহাশয় বালবিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দ্দশা দেখিয়া কাতর হইয়াছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার পক্ষে ইহা একটা প্রধান যুক্তিরূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধবাবিবাহের অপ্রচলন হিন্দুর সমাজজীবনের উপর আরও নানাদিক দিয়া যে ঘোর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে, আজ তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

প্রথমত, বিধবাবিবাহের অপ্রচলন হেতু, হিন্দুসমাজের সর্ব্বস্তরে যে সব নারী সুস্থ সবল শিশুর জন্ম দিতে পারিত, তাহাদিগকে জোর করিয়া "বন্ধ্যা" করা হইতেছে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায়,—হিন্দু সমাজে ১৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বিধবার সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। এই ৫ লক্ষ যুবতী নারীকে আমরা কেবল গৃহসুখ ও সন্তানস্নেহ হইতে বঞ্চিত করি নাই—হিন্দুসমাজকেও বহু সুস্থ সবল শিশু হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। জাতির নিকটে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নিকটে ইহা আমাদের গুরুতর অপরাধ। মুসলমানদের মধ্যে (তথা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও) বিধবাবিবাহে কোন বাধা নাই। সুতরাং তাহাদের সংখ্যা যে তুলনায় হিন্দুদের অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বাড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি। ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের হিন্দু বিধবার সংখ্যা ১৩,০১,৬৩৩। পূর্ণ তালিকা এইরূপ :—

বয়স	বিধবার সংখ্যা
০-৫	৩০১৫
৫-১০	১১,৮০৮
১০-১৫	২৫০৮৩
১৫-২০	৯০,১০৫
২০-২৫	১,৪০,৭৫২
২৫-৩০	২,১৯,২৫৪
৩ -৩৫	২,৪৭,৩৭২
৩৫-৪০	১,৮১,৫০৬
৪০-৪৫	২,৮২,৭৩৮
	১৩,৯১,৬৩৩

৪৫এর উর্দ্ধবয়স্কা বিধবার সংখ্যা ১০,৮৫,০২৪।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানচাঁদ তাঁহার বহু তথ্যপূর্ণ—India's Teeming Millions নামক গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতে হিন্দুজাতির আপেক্ষিক সংখ্যাহ্রাসের প্রধান কারণ, তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের অপ্রচলন।

"This is a sore point and has given rise to misgivings among the Hindus regarding future.···out of 10.66 million widows of child-bearing age, 8.31 million are Hindus i.e. about 78 Percent. As the Hindu population is 68 Percent of the total population of the country, the proportion of the Hindu widows aged 15-45 is ten percent in excess of their proportion of population."

ডাঃ জ্ঞানচাঁদ আরও বলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ নিষেধ করিবার ফলেই বিধবার সংখ্যা আরও বাড়িতেছে।

"The ban on widow remarriage has another baneful result, whereby it becomes itself a cause of the increase in the number of widows in India. There is a deficiency of women compared with men which is accentuated by widows being forbidden to remarry. As remarriage amongst widowers is quite common and widows cannot remarry, the former have to marry girls very much younger than themselves. Even bachelors, owing to the deficieney of women, cannot find mates of suitable age and have to seek them among girls very much their junior. Marriage of comparatively old men with young women means, of course, that the latter outlive their husbands and not infrequently become widowed long before they have completed their reproductive period. This, besides causing maladjustment and emotional poverty for women married to older men, leads to an increase in the number of reproductive women whom this bad social custom makes relatively sterile."

অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে বিপত্নীকেরা (তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে) তাহাদের তুলনায় অনেক কমবয়স্ক বালিকা কুমারীদের বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। অধিকবয়স্ক অবিবাহিত পুরুষেরাও বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে এইরূপ অল্পবয়স্কা কুমারীকেই বিবাহ করে। ফলে ঐ সব বালিকারা প্রায়শঃই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিধবা হয়। অর্থাৎ বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে বিধবার সংখ্যা আরও বাড়িতেছে। ইহার আর একটী অনিষ্টকর ফল, অধিকবয়স্ক পুরুষদের সহিত বিবাহিতা এই সব অল্পবয়স্কা নারীদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি পূর্ণবিকাশের সুযোগ পায় না। মধ্যপথেই তাহাদিগকে বন্ধ্যা

হইতে হয়। এরূপ অসম বিবাহে হৃদয়বৃত্তি ও নীতির দিক দিয়াও যে মর্ম্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া ডাঃ জ্ঞানচাঁদ গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছেন,—

It is a vicious circle. We have a disproportionately large number of widows because of early marriage and their number is increasing just because remarriage is made impossible for them. Widows, more widows, is the consequence of widows bering forbidden to marry by religion and social custom."

বিধবাবিবাহ নিষেধের সঙ্গে হিন্দুনারীর সংখ্যাহ্রাসও উল্লেখযোগ্য। আর হিন্দুনারীর সংখ্যাহ্রাস যে, হিন্দুসমাজের ক্ষয়ের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী "বাঙলার ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু" নামক একখানি পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন,—

"জীবজগতে দেখা যায়, যে জীবের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অধিক, সেই জীবেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জীবনসংগ্রামে সেই জয়ী হয়। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে নারীর সংখ্যা-ন্যূনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র ভূমিজ ও বৈষ্ণব সমাজ (জাত বৈষ্ণব) ব্যতীত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে নারীর আপেক্ষিক সংখ্যা কম এবং নারীর সংখ্যা অবিরাম কমিতেছে। যদি এই ভাবে নারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিতে থাকে, তবে পরিণামে বাঙ্গালী হিন্দুর লয়প্রাপ্তি অনিবার্য্য। কোন কোন জাতির মধ্যে নারীর সংখ্যা এত কমিয়াছে যে, এখন পাঞ্জাবী ও সিন্ধির ন্যায় তাহাদের বিবাহের জন্য অন্য প্রদেশের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলায় হিন্দু নারীর সংখ্যা কিরূপ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে নিম্নলিখিত সংখ্যা দ্বারা তাহা

বুঝা যাইবে। প্রতি হাজার হিন্দু পুরুষে হিন্দু নারীর সংখ্যা কোন সালে কত ছিল, তাহার হিসাব দেওয়া হইল।"

	পুরুষ	নারী
১৮৭২	১০০০	১০০৩
১৮৮১	,,	৯৯৯
১৮৯১	,,	৯৬৯
১৯০১	,,	৯৫১
১৯১১	,,	৯৩১
১৯২১	,,	৯১৬
১৯৩১	,,	৯০৮

কোন সমাজে নারীর সংখ্যাহ্রাসের সঙ্গে তাহার জীবনীশক্তি হ্রাসের সম্বন্ধ আছে, এরূপ সন্দেহের কারণ আছে। বাঙলায় হিন্দুনারীর সংখ্যা হ্রাস, বাঙালী হিন্দুদের জীবনীশক্তি হ্রাসেরই সূচনা করিতেছে কি ?

একদিকে নারীর সংখ্যাহ্রাস, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ নিষেধ—এই দুইয়ে মিলিয়া হিন্দুসমাজকে দ্রুত ক্ষয় করিতেছে। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান সমাজে বিধবার সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক, পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যাও বেশী। সুতরাং মুসলমানদের সংখ্যা যে তুলনায় দ্রুত বাড়িবে তাহা আর বিচিত্র কি।

বিধবাবিবাহ নিষেধের পরিণাম—২

হিন্দুসমাজের অল্পবয়স্কা বিধবারা যে কেবল মাতৃত্বের দিক হইতে "বন্ধ্যা" হইয়া থাকে তাহা নহে, সমাজজীবনে দুর্নীতি ও ব্যভিচার বিস্তারেও সহায়তা করে। হিন্দু বিধবারা দেবী, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া কেবল পরহিতার্থে জীবনধারণ করিয়া থাকেন, ইত্যাকার বড় বড় কথা বলিতে আমরা খুবই উৎসাহ বোধ করিয়া থাকি। ঐরূপ ব্রহ্মচারিণী নিষ্কাম ব্রতধারিণী হিন্দুবিধবা যে সমাজে আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা আমাদের নমস্যা। কিন্তু যতদিন হিন্দুসমাজের প্রত্যেক পুরুষ বা অধিকাংশ পুরুষ কামজয়ী না হইতেছে, ততদিন সমস্ত হিন্দুবিধবাই যে নিষ্কাম ব্রহ্মচারিণী হইবেন, এরূপ আশা করা কি মূঢ়তা ও আত্মপ্রতারণা নহে? গোঁড়া সনাতনীরা বিধবাবিবাহের নামেই শিহরিয়া উঠেন এবং বলেন যে, উহাতে হিন্দুবিবাহের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের সৌধ-চূড়া ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু বিপত্নীক পুরুষেরা পুনঃপুনঃ এমন কি ৮০ বৎসর বয়সেও বিবাহ করিলে যদি হিন্দুবিবাহের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ খর্ব্ব না হয়, তবে বিধবারা বিবাহ করিলেও উহা খর্ব্ব হইবার আশঙ্কা নাই। জন্মান্তরের দোহাই দেওয়াও বৃথা, কেননা একপক্ষ যদি এ জন্মেই সম্বন্ধের সূত্র ছিন্ন করিয়া দেয়, তবে অন্যপক্ষ পরজন্ম পর্য্যন্ত তাহার জের টানিবে কেন?

কিন্তু এসব আধ্যাত্মিক ছেঁদো কথা লইয়া আমরা বিচার করিতে বসি নাই। বিধবাবিবাহের অপ্রচলন হেতু হিন্দুসমাজে যে দুর্নীতির প্রাবল্য ঘটিয়াছে, এই নিতান্ত "ইহলৌকিক" কথাটাই আমরা বলিতে চাই।

বাঙলাদেশে যে হিন্দুনারীহরণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে হিন্দুসমাজে বালিকা ও যুবতী বিধবার আধিক্যের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা যে স্বেচ্ছায় নারীহরণকারীদের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে, ইহাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য অরক্ষিতা বিধবাদিগকেই দুর্ব্বৃত্তেরা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। অপহৃতা হিন্দুনারীদের মধ্যে সধবার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, ইহাও সকলেই জানেন। এই সব বলপূর্ব্বক অপহৃতা ও নিগৃহীতা নারীদের হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে না, ফলে হয় তাহারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহাদের পরিবারভুক্ত হয়, অথবা ভিক্ষুকবৃত্তি বা পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। অথচ যে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানের দোহাই সনাতনীরা কথায় কথায় দিয়া থাকেন, সেই স্মৃতিশাস্ত্রে বলপূর্ব্বক অপহৃতা ও নিগৃহীতা নারীদের—এমন কি স্বেচ্ছায় বিপথগামিনী নারীদেরও সমাজে পুনর্গ্রহণ করিবার উদার ব্যবস্থা আছে। পরলোকগত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ লিখিয়া ইহা দেখাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মূঢ় হৃদয়হীন লোকাচার ও দেশাচারের ফলে অপহৃতা ও নিগৃহীতা হিন্দু বিধবারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়াতে একদিকে হিন্দুসমাজের যেমন ক্ষতি হইতেছে, অন্যদিকে মুসলমানসমাজের তেমনি লাভ হইতেছে। যে হিন্দু পুরুষেরা আততায়ী দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে নারীদের রক্ষা করিতে অক্ষম, তাহারাই আবার নিগৃহীতা নারীদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী, এর চেয়ে ক্লৈব্য ও কাপুরুষতা আর কি হইতে পারে!

অসহায়া হিন্দু বিধবাদের সম্পর্কে আর একটি শোচনীয় চিত্রের পরিচয় দিব। ইহা হয়ত অনেকে জানেন না, অথবা জানিয়াও ঘটনার গুরুত্ব

উপলব্ধি করিতে পারেন না। নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে বহু হিন্দু বিধবা 'বাস করে। ইহারা যে সকলেই বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য তীর্থবাসিনী হয়, তাহা নহে। বহু অল্পবয়স্কা বিধবাও ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, তাহারা মুহূর্ত্তের ভুলে পদস্খলনের জন্য বাধ্য হইয়া দেশ ও সমাজ ত্যাগ করিয়া তীর্থে জীবনযাপন করিতে আসিয়াছে। তীর্থেও তাহারা কেবল ধর্ম্মাচরণ করিয়া জীবনযাপন করে, এমন কথা বলা যায় না। কাশী, বৃন্দাবন, পুরী ও নবদ্বীপে অজ্ঞাতনামা মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদের একশ্রেণীর দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা আখড়া আছে। সেখানে অসহায়া বিধবারা সকাল ও সন্ধ্যায় নাম গান করিয়া চাউল ও পয়সা ভিক্ষা পায়। বৃন্দাবনে আমি নিজে ঐরূপ একটি দাতব্য আখড়ায় গিয়া দেখিয়াছি, নামগানকারী ভিক্ষার্থিনীদের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্কা বাঙ্গালা হিন্দু বিধবা। দেখিয়া মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, এইসব গৃহহারা অনাথিনী বিধবাদের ভিক্ষাবৃত্তির জন্য দায়ী যে হৃদয়হীন সমাজ, তাহার কি কখনও কল্যাণ হইতে পারে? আমি বৃন্দাবনে থাকিতেই একটা ঘটনা ঘটিল। একদিন শুনিলাম, দাতব্য আখড়ারই একজন হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী জনৈক ভিক্ষার্থিনী বাঙ্গালী বিধবাকে অপহরণ করিয়াছে। পুলিশে খবর দেওয়া হইল এবং অপহৃতা মেয়েটিকে ঐ হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারীর গৃহে পাওয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় ভদ্রলোকদের চেষ্টায় হিন্দুস্থানী যুবকটি বাঙ্গালী বিধবাকে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়ায় ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি হইল। পরে আমি জানিলাম, ঐ শ্রেণীর ঘটনা বিরল নহে। বলা বাহুল্য, অপহরণকারীর সঙ্গে অপহৃতা বিধবার বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় না।

বৃন্দাবনে গৃহহারা অল্পবয়স্কা বিধবারা কিরূপ জীবনযাপন করে, তাহার

একটী শোচনীয় নিদর্শন দেখিলাম, তথাকার আমেরিকান খৃষ্টান মিশন হাসপাতালে। এই হাসপাতালে বহু হিন্দুবিধবা সন্তানপ্রসব করিবার জন্য আশ্রয় লয়। হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের খুব সেবাযত্ন করেন। আরোগ্য লাভ করিলে তাহারা শিশুটিকে হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রাখিয়া যায়। অনুসন্ধানে জানিলাম, আমেরিকান মিশনের মথুরা, আগ্রা, রাউলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ আরও কয়েকটি হাসপাতাল আছে। পরিত্যক্ত শিশুদের ভার মিশন কর্ত্তৃপক্ষই গ্রহণ করেন। মিশনের অনাথ শিশুভবনে উহাদিগকে পালন করা হয় এবং বড় হইলে লেখাপড়া শিখাইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। এইসব শিশুদের চিত্রসহ পুস্তিকা ছাপাইয়া মিশন কর্ত্তৃপক্ষ আমেরিকায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের নামে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করেন। আমি ঐ শ্রেণীর পুস্তিকা কয়েকখানি দেখিয়াছি। বৃন্দাবনে খৃষ্টান মিশন হাসপাতালের মত হিন্দুদের স্থাপিত কোন হাসপাতাল নাই। অর্থাৎ হিন্দুসমাজের গ্লানি বহন করিবার ভার শেষ পর্য্যন্ত খৃষ্টান মিশনারীরাই গ্রহণ করে এবং "অসভ্য হিন্দুদের" দেশে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের মহৎ গৌরব অনুভব করে। কিঞ্চিৎ সুখের বিষয়, নবদ্বীপে হিন্দুদের চেষ্টায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী "মাতৃমন্দির" স্থাপিত হইয়াছিল। যতদূর জানি, এখনও উহার কাজ চলিতেছে।

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদীরা শাস্ত্রের যুক্তি ছাড়া আরও এক শ্রেণীর যুক্তি উত্থাপন করেন। প্রথমত, হিন্দুসমাজে কুমারীদের বিবাহ দেওয়াই দুঃসাধ্য হইয়াছে, এ অবস্থায় বিধবাদের বিবাহ দিলে সমস্যা আরও জটিল হইবে। দ্বিতীয়ত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, কেবল বালবিধবারা নহে, অধিকবয়স্কা বিধবারাও বিবাহ করিতে আরম্ভ করিবে। এই দুটি যুক্তিই বালকোচিত। অল্পবয়স্কা কুমারী এবং অল্প-

বয়স্কা বিধবার মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। একজনের যদি বিবাহ হইতে পারে, আর একজনের হইবে না কেন? ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বাঙলার হিন্দুসমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা ৩৮ লক্ষ ২৮ হাজার বেশী (১৯৩১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট)। সুতরাং কুমারী ও বালবিধবার মধ্যে বিবাহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবার কারণ নাই। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই যে, বিধবাবিবাহের স্বাধীনতা দিলে যে সমস্ত বিধবাই বিবাহ করিবে, কোন মনুষ্য চরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিই এমন কথা বলিবেন না। আর যে সমাজে বিপত্নীক পুরুষেরা যতবার ইচ্ছা এবং যত বয়স পর্য্যন্ত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, সেখানে বিধবাদের সম্বন্ধে এরূপ আপত্তির কোন মূল্যই নাই।

মোট কথা, সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বিধবা বিবাহের সুপ্রচলন অত্যাবশ্যক। নৈতিক, সামাজিক, জৈবনিক কোন দিক দিয়াই বিধবা-বিবাহ বর্জ্জন সমর্থনীয় নহে। বিধবাবিবাহ সুপ্রচলিত করিতে না পারিলে, হিন্দুসমাজের বহু জটিল সমস্যারই সমাধান করিতে পারা যাইবে না। বিধবা বিবাহ বর্জ্জনরূপ কুপ্রথা হিন্দু সমাজের উপর নানাদিক দিয়া যে ঘোর অনিষ্টকর ফল প্রসব করিয়াছে এবং করিতেছে, ভাষায় তাহার বর্ণনা করা যায় না।

নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ ও অহিংসা

হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নজাতীয়দের মধ্যে যে শ্রমবিমুখতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এই সমাজের পক্ষে নিশ্চয়ই শুভলক্ষণ নহে। শ্রমবিমুখতার সঙ্গে জীবনীশক্তিহীনতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, একের উপর অন্যে প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে একদিকে নিম্নজাতীয়দের মধ্যে যেমন উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইতেছে, অন্যদিকে অ-হিন্দুদের সঙ্গে জীবন সংগ্রামেও তাহারা ক্রমে ক্রমে পরাস্ত হইতেছে। হিন্দু কৃষকদের সংখ্যা হ্রাসের কথা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজেও যে হিন্দুরা মুসলমান ও অন্যান্য অ-হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নানাক্ষেত্রে পরাস্ত বা পশ্চাৎপদ হইতেছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

নিম্নজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে এই শ্রমবিমুখতা এবং জীবনশক্তিহীনতা কোথা হইতে আসিল? সহসা ইহা ঘটে নাই; দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাজের শূদ্রশক্তির উপর হিন্দুসমাজ যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, তাহারই শোচনীয় প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। "শূদ্রকে" আমরা চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, কোন উচ্চতর সম্মানজনক কাজের অধিকার তাহাদের দিই নাই। তাহারা জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারিত না, যুদ্ধ করিতে পারিত না, এমন কি অনেকক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্যেও তাহাদের অধিকার ছিল না। ফলে একদিকে তাহাদের সহানুভূতি হইতে আমরা যেমন বঞ্চিত হইয়াছি, অন্যদিকে নিজেদের প্রতিও তাহারা অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে, নিজেদের বৃত্তিকে তাহারা হীন, অসম্মানজনক ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশীদের আক্রমণে বার

বার বিধ্বস্ত হইয়াছে, তখন রাজগণ এবং তাঁহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ক্ষত্রিয়েরাই সেইসব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। রাজগণ "শূদ্রশক্তির" সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই, তাহারাও দেশরক্ষার্থ যুদ্ধ করে নাই বা কোনরূপ সাহায্য করে নাই। ফলে রাজ্য ও রাজ-সিংহাসনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আর দেশের বিশাল শূদ্রশক্তি তাহা অদৃষ্টের বিধান বলিয়াই মানিয়া লইয়াছে। কোনরূপ চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ প্রকাশ করে নাই, বিদ্রোহও করে নাই। তাহাদের জীবন বদ্ধজলার মত যেমন ছিল, তেমনই থাকিয়া গিয়াছে। গ্রীক ও চীনা ভ্রমণকারীরা ভারতবাসীদের তারিফ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, একদিকে দুই সৈন্যদলে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্রেরই অনতিদূরে কৃষকেরা শান্তভাবে চাষ করিতেছে, এ দৃশ্য কেবল ভারতবর্ষেই দেখা যাইত। আমরাও আমাদের প্রাচীনকালের আধ্যাত্মিক গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ বিদেশী ভ্রমণকারীদের এইসব বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সগর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু জাতির পক্ষে যে ইহা কত বড় অসম্মানকর, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় পাই নাই। যদি দেশের শূদ্রশক্তি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের পশ্চাতে থাকিত, তবে গজনীর মামুদ অষ্টাদশবার ভারত আক্রমণ করিতে পারিত না, সোমনাথের মন্দির এবং মথুরানগরও লুণ্ঠন করিতে পারিত না। মহম্মদ ঘোরীও অত সহজে পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থল অধিকার করিতে পারিত না। মহারাষ্ট্র-কেশরী ছত্রপতি শিবাজী এবং পাঞ্জাব-কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহ-ই প্রথমে দেশরক্ষায় শূদ্রশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনেকাংশে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাক্ সে কথা। দেশের শূদ্রশক্তি বা নিম্নজাতীয় হিন্দুরা নিজেদের হীন বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হওয়াতেই তাহাদের মধ্যে

শ্রমবিমুখতা আসিয়াছে। জীবনে অবসাদ এবং নৈরাশ্যও তাহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। অন্যান্য সমাজে "শূদ্রশক্তি"রূপে যাহাদের অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহারা নিজেদের অবস্থায় কখনও সন্তুষ্ট থাকে নাই, ক্রমাগত বিদ্রোহ করিয়াছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের নিকট হইতে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের "শূদ্রশক্তিকে" আমরা বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদের কাঠামোর মধ্যে মায়াবাদ, অদৃষ্টবাদ ও কর্ম্মফলের আফিম খাওয়াইয়া অবসন্ন ও নির্জ্জীব করিয়া রাখিয়াছি। তাই আজ তাহারা কর্ম্মকে ও শ্রমকে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছে। উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোকেরা যেসব বৃত্তি করে না, সেই সমস্ত কাজ যে হেয় ও মর্য্যাদাহানিকর, এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, জীবনের প্রতি একটা ঔদাসীন্য। Will to live বা বাঁচিবার ইচ্ছা যেমন ব্যক্তির জীবনীশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তির উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। হিন্দুসমাজের নিম্নজাতীয়দের অর্থাৎ শূদ্রশক্তির মধ্যে এই will to live বা বাঁচিবার ইচ্ছার অভাব ঘটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তিহীনতা এবং উৎপাদিকা শক্তিহ্রাসের ইহা একটা বড় Biological বা জৈবনিক কারণ।

এই শ্রমবিমুখতা তথা কর্ম্মবিমুখতার ভাব দেশের জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মও বহুল পরিমাণে দায়ী। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল শূন্যবাদ,—পরলোকে নির্ব্বাণ এবং ইহলোকে নৈষ্কর্ম্ম্যের মাহাত্ম্য। যদি ত্রিবিধ দুঃখকে জয় করিতে চাও, তবে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে, তবেই পরলোকে নির্ব্বাণলাভ সম্ভবপর হইবে। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারিত সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। উচ্চস্তরের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এই আদর্শ অনুসরণ

করিয়া গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করিবার একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিল। তাহার ফলে হিন্দুসমাজের তথা ভারতবর্ষের যে ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে, ঐতিহাসিকগণ নানাভাবে তাহার বিচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহার অধোগতির জন্য এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসবাদ বহুল পরিমাণে দায়ী, এমন কথা ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের উপর অর্থাৎ জনসাধারণের উপর এই নৈষ্কর্ম্ম্য ও সন্ন্যাসবাদের প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল আরও ভয়াবহরূপে। বৌদ্ধমতবাদের মধ্যে যাহা কিছু উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ছিল, জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহারা বুঝিল যে, ইহলোক মায়াময়, অসার, সংসার শুধু কর্ম্মবন্ধনজনিত দুঃখপূর্ণ; অতএব এই সমস্ত তুচ্ছ জিনিষের দিকে মন না দিয়া পরলোকে নির্ব্বাণমুক্তির জন্য প্রস্তুত হওয়াই মানুষের কর্ত্তব্য। এই মনোভাব ভারতের জনসাধারণের মধ্যে কর্ম্মবিমুখতা এবং জীবনের প্রতি একটা বৈরাগ্যময় অবসাদ আনিয়া দিল। উহার ফলও হইল অত্যন্ত শোচনীয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ-শূন্যবাদ ও মায়াবাদের প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারিলেন না, বৌদ্ধ সন্ন্যাসবাদকেও তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত নৈষ্কর্ম্ম্যের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ দেখিতে পাই শ্রীমদ্‌ভগবতগীতায়। ঠিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে গীতার বাণী শুনাইয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমরা কোন সংশয় ও তর্ক উত্থাপন করিব না। তবে গীতার মতবাদ যে বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু যিনি

কতকটা স্বাধীন মন লইয়া গীতাপাঠ করিবেন, তিনিই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, গীতায় কর্ম্মযোগেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। গীতার আগাগোড়া নানাভাবে কর্ম্মের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে। লোকমান্য তিলক গীতাকে এইভাবেই বুঝিয়াছেন। গীতা বলিলেন, সকাম কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করা কোন মানুষের পক্ষেই কল্যাণকর নহে। অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হইবে, ইহাই গীতার মহাশিক্ষা। গীতায় শ্রীভগবানের মুখে উচ্চারিত হইল—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা
ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্
উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥

সমাজের উচ্চস্তরের শিক্ষিত লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া হইল—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ
অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি
বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

অর্থাৎ অজ্ঞ লোকদিগকে বড় বড় কথা বলিয়া কর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া বিপথে চালিত করিও না; যাঁহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তাঁহারা নিজে কর্ম্ম করিয়া সাধারণ লোকদিগকে পথ দেখাইবেন। নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের ফলে ভারতের জনসমাজে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য গীতার এই মহা উপদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়,

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গীতার কর্ম্মযোগ প্রচারের ফলেও হিন্দু সমাজের মধ্য হইতে কর্ম্মবিমুখতার ভাব দূর হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারিত অহিংসাবাদের বিরুদ্ধেও গীতায় আমরা প্রবল বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইতে দেখি। বৌদ্ধ 'অহিংসা' যে ভারতবর্ষে শেষ পর্য্যন্ত একটা জড়তা ও নিবীর্য্যতা আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং উহার ফলে জাতির মধ্যে কাপুরুষতা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। এই নিবীর্য্যতা ও কাপুরুষতার পরিণামস্বরূপই ভারতবর্ষ প্রথমে পাঠান ও পরে মোগলদের অধিকৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মকে বিলুপ্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের যে পুনর্জাগরণ হইল, তাহা বহু শতাব্দীকৃত জাতির এই শোচনীয় অধোগতি রোধ করিতে পারে নাই। হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জাগরণের সূচনাতেই গীতার অহিংসাবাদ-বিরোধী তূর্য্যনাদের মধ্য দিয়া ক্ষাত্রবীর্য্যের মহিমা ঘোষিত হইয়াছিল—

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং,
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায়
কৃতনিশ্চয়ঃ ॥

কিন্তু গীতার এই মহাবাণী হিন্দুভারত সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই তাহার অধঃপতনও রোধ করা যায় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারিত অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতি একদিক দিয়া মানবসভ্যতার অতি উচ্চ আদর্শ সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের পরে যেসব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাতেও প্রধানতঃ ঐসব আদর্শই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'আদর্শ' হিসাবে যতই উচ্চ হোক, অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতি কমনীয় গুণাবলী কোন জাতির মধ্যে অতিরিক্ত বিকাশপ্রাপ্ত হইলে উহা যে

শেষ পর্য্যন্ত ঐ জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, এই নিষ্ঠুর সত্যও অস্বীকার করা যায় না। মানবসভ্যতার মধ্যে এই যে Paradox বা প্রহেলিকা আছে, তাহা বিস্ময়কর মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা সত্য। বস্তুত সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে কোন জাতির মধ্যে যতই প্রেম, অহিংসা, সৌন্দর্য্যবোধ, রসানুভূতি প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে, ততই জীবনসংগ্রামে সেই জাতি অপেক্ষাকৃত অক্ষম হইয়া পড়িতে থাকে। অবশেষে নিকৃষ্ট সভ্যতাবিশিষ্ট কোন বীর্য্যবান্ বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক সে পরাস্ত হয়। গ্রীকেরা এইভাবে রোমক জাতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিল, রোমকেরা আবার গথদের হাতে পরাজিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সভ্যতর হিন্দুরাও সেইভাবে তুর্কী পাঠান ও মোগলদের কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কোন কোন মনীষীর মতে কেবলমাত্র কমনীয় গুণের বিকাশকে সভ্যতার পূর্ণবিকাশ বলা যাইতে পারে না। বীর্য্য, পৌরুষ প্রভৃতি 'কঠিনতর' গুণাবলীও সভ্যতার আর একটা দিক। যে জাতির মধ্যে এইসব গুণের অভাব ঘটিয়াছে, পক্ষান্তরে কেবলমাত্র কমনীয় গুণাবলীর চরমোৎকর্ষ হইয়াছে, সে জাতিকে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অধিকারী বলা যাইতে পারে না। আমরা এই মত সমর্থন করি। আমাদের মনে হয়, গীতাতে এই পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার আদর্শই কীর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দুজাতি যদি সেই পূর্ণ আদর্শ সম্যকরূপে উপলব্ধি ও গ্রহণ করিতে পারিত, তবে তাহার এই দুর্দ্দশা হইত না।

বৌদ্ধ অহিংসা ও মৈত্রীর পরে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেম ও অহিংসা আসিয়া এইদিক দিয়া অবস্থার কোন উন্নতিসাধন করে নাই, বরং হিন্দুজাতিকে আরও বেশী শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ ও নির্বীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে নিম্নস্তরের হিন্দু জনসাধারণ। হিন্দুরা যে আজ Mild Hindu বা 'নিরীহ হিন্দু' অপবাদ লাভ করিয়াছে,

জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযোগী Aggressiveness বা সবল মনোবৃত্তি তাহার মধ্যে নাই, বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রচারিত অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতিরই উগ্র প্রতিক্রিয়া। এই কারণে মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত নব্য অহিংসাবাদকেও জাতির পক্ষে আমরা সব দিক দিয়া কল্যাণকর মনে করি না।* হিন্দুজাতিকে আজ বাঁচিতে হইলে গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে এবং প্রেম ও অহিংসার আতিশয্যের মোহমুক্ত হইয়া কঠিন বীর্য্য ও পৌরুষের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

হিন্দু ভদ্রলোক

বাঙলার হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় এখনও হিন্দুসমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং ইহাদের মঙ্গলামঙ্গলের উপর বাঙলার হিন্দুসমাজের শুভাশুভ অনেকখানি নির্ভর করে। বৃটিশ শাসনের আরম্ভে এই হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী শিক্ষালাভ করে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত ও হলাহল দুই-ই উঠিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া হিন্দুসমাজের পক্ষেও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে যে নবজাগরণের ভাব হিন্দুসমাজ এবং তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র দেশে আসিয়াছে, তাহাত আমরা চোখের উপরেই দেখিতেছি। গত এক শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সামাজিক সংস্কারে, রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসম্প্রদায়ই এ বিষয়ে নেতৃত্ব

---

* পরিশিষ্টে 'মানবসভ্যতায় অহিংসার স্থান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে। কবি, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাসংস্কারক; সমাজসংস্কারক, জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, রাজনৈতিক নেতা ইহাদের মধ্য হইতেই হইয়াছে। নবযুগের বাঙালী জাতি যাহা কিছু শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্ব্ব করে তাহা এই হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়েরই দান, একথা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। আজ যে বিশাল বাঙলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সম্মানের আসন লাভ করিয়াছে, তাহাও প্রধানত এই হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি। সুতরাং এই দিক দিয়া হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় কেবল স্ব-সমাজের নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির, এমন কি সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির কল্যাণ সাধন করিয়াছে

কিন্তু সমুদ্রমন্থনে যে হলাহল উঠিয়াছে, তাহাও আজ প্রধানত এই হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়কেই পান করিতে হইতেছে। পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিয়া হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় দেশ ও জাতির একদিক দিয়া মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে বটে, কিন্তু নিজেরা আজ বিষম অর্থনৈতিক সঙ্কট তথা ধ্বংসের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসকেরা এদেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার মূলে বিশেষ কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এ দেশের শাসনকার্য্যে সহায়তা করিতে পারে এমন একদল লোককে তৈরী করা। স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল ঐ সহকারীর দল তৈরী করার অভিপ্রায়। তাই গত এক শতাব্দী ধরিয়া সরকারী এবং তাহারই আদর্শে পরিচালিত বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহ হইতে প্রধানত ডেপুটি, মুন্সেফ, ইস্কুল মাষ্টার, উকীল, মোক্তার, কেরাণী, গোমস্তার দল বাহির হইয়াছে। যে ২।৪ জন অন্য ধরণের মানুষ তৈরী হইয়াছে, তাহা এই শিক্ষাপ্রণালীকে অতিক্রম করিয়াই হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সরকারী ও আধা সরকারী চাকুরীর লোভে হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় গত এক শতাব্দী ধরিয়া প্রাণপণে ইংরাজীশিক্ষা লাভ করিয়াছে। প্রথম প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প ছিল, সুতরাং সরকারী চাকুরী পাওয়াও সহজ ছিল। উকীল, মোক্তার প্রভৃতি হইয়াও বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করা যাইত। সুতরাং হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া, এমন কি গ্রামভিটা জমিজমা ছাড়িয়া ইংরাজী শিক্ষা এবং সরকারী ও আধা সরকারী চাকুরীর পিছনে ছুটিয়াছে। আজ এক শতাব্দী পরে দেখিতেছি, মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া আমরা মরুভূমিতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার কারখানা হইতে দলে দলে যে সব যুবক বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহারা কোন সরকারী বা আধাসরকারী চাকুরী পাইতেছে না,—ওকালতী, মোক্তারী প্রভৃতি করিয়াও জীবিকানির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ; পক্ষান্তরে যে শিক্ষা তাহারা লাভ করিতেছে, তাহাতে জীবনসংগ্রামে অন্য কোন ক্ষেত্রেও তাহারা আত্মরক্ষার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছে না। ইতিমধ্যে হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য ও আত্মবিস্মৃতির সুযোগ লইয়া বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশবাসীরা আসিয়া বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং অবস্থা সব দিক দিয়াই ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে, হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এই সঙ্কটের সমাধানের উপায় যদি এখন হইতেই করা না যায়, তবে হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় ভবিষ্যতে লুপ্ত হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কার কারণও আছে।

এই সঙ্কট সমাধানের উপায় কি ? প্রবীণ ও বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীরই আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এখন যে ‘কেতাবী শিক্ষা’ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমানের কঠোর জীবন

সংগ্রামে শিক্ষিত যুবকদের অন্নসমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এমন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক কৃষি ও শিল্পশিক্ষাই হইবে প্রধান অঙ্গ। বর্ত্তমান যুগে অন্যান্য সভ্যদেশেও এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি আমাদের দেশে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা যায়, তবে যুবকেরা সরকারী চাকুরী, কেরাণীগিরি প্রভৃতির মোহ ত্যাগ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইবে। আমাদের মতেও বাঙলার হিন্দু ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে পুরাতন কেতাবী শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীর পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃষি, শিল্পবাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি অবলম্বন করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশেও সরকারী ও আধা সরকারী চাকুরীতে সামান্য সংখ্যক লোকেরই প্রয়োজন হয়। একটা সম্প্রদায় বা শ্রেণী কেবল উহারই উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাহার উপর এ দেশে সম্প্রতি রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে হিন্দু ভদ্রলোকদের পক্ষে সরকারী চাকুরী পাওয়া খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে। সুতরাং হিন্দু ভদ্রলোকেরা যদি সময় থাকিতে জীবনের গতি পরিবর্ত্তন না করে, তবে তাহাদের ভবিষ্যৎ নিতান্তই অন্ধকারময় হইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু নূতন পন্থা অবলম্বনের পথে কতকগুলি প্রবল বাধা আছে। প্রথমত শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে,—ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, কর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপন করিতে প্রচুর অর্থ ও উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন। কেবলমাত্র দেশের গবর্ণমেণ্টই এই কার্য্য করিতে সক্ষম, যদিও দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এই কার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি যুবককে কেবলমাত্র ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প

ইত্যাদি শিক্ষা দিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। ঐ শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা উপযুক্ত কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিবে কিনা, তাহাও চিন্তা করিতে হইবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্মক্ষেত্র বড় বেশী নাই। সেজন্য দেশে নূতন নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্প যতদূর সম্ভব পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলাও একটা উপায়। কিন্তু এই সমস্ত উপায়ও বহুল পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও সহ-যোগিতার উপর নির্ভর করে। দেশে যে সব হিন্দু ধনী ও ব্যবসায়ী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যদি নূতন নূতন শিল্প-বাণিজ্য গঠনে অধিকতর অর্থ নিয়োগ করেন, তাহা হইলে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে বটে।

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত ২।৪ দিন বা ২।৪ মাসের কাজ নয়, কতকগুলি লোক খেয়ালমাফিক একটা কিছু করিলেও চলিবে না। একটা অর্থনৈতিক "পরিকল্পনা" করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ প্রণালীতে এই কাজ করিতে হইবে। জাতির মনে যদি শুভবুদ্ধি জাগে এবং শক্তিশালী, প্রতিভাবান, দূরদর্শী লোকেরা এইসব কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তবেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন হিন্দু ভদ্রসম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে করিতে পারি না। অদূরে ভবিষ্যতেই বিষম অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে তাহাদের সংগ্রাম করিতে হইবে। জয়পরাজয় অনিশ্চিত।

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনের প্রথম হইতেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া সরকারী ও আধা-সরকারী চাকুরীর প্রধান অংশ দখল করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অন্যান্য প্রদেশের লোকেও ইংরাজীশিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালীর সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করিতেছে। সুতরাং বাঙালীর পক্ষে অন্যান্য প্রদেশেও কাজ

পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। অন্যান্য প্রদেশে যে "বাঙালী বিদ্বেষ" দেখিতে পাই, তাহার মূলে প্রধানত এই অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান।

এই সঙ্গে আরও একটী চিন্তার বিষয় আছে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে হইতেই হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ জমিদার ও ভূস্বামীরূপে গ্রামে বাস করিতেন। ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেই পুরাতন জমিদারদের মধ্যে অনেককে স্থায়িত্বদান করে এবং নূতন নূতন জমিদার জোতদার, পত্তনীদার, তালুকদার প্রভৃতি নানা মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি করে। গত দুই শত বৎসর ধরিয়া এই সব হিন্দু জমিদার, তালুকদার ও জোতদার প্রভৃতি বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের উপর নানাদিক দিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।*

সেকালে বাঙলার গ্রামে হিন্দু জমিদারেরাই ছিলেন অনেক স্থলে সমাজের শীর্ষস্থানীয়। জমিদারদের দোষ ত্রুটী অনেক ছিল বটে, প্রজাদের উপর তাঁহারা অনেক সময় উৎপীড়ন করিতেন, একথাও সত্য। কিন্তু জমিদারদের গুণও যে কিছু ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। লোকের উপকারের জন্য তাঁহারা বহু সৎকার্য্য করিতেন, আপদে বিপদে প্রজাদের সাহায্য করিতেন, প্রজারাও তাঁহাদিগকে "মা বাপ" বলিয়াই জানিত। জমিদারদের বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব পূজা অনুষ্ঠানে, বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে গ্রামের দরিদ্র প্রজারা নিঃসঙ্কোচে যোগ দিত। উহার ফলে তাহারা আর্থিক দিক দিয়াও উপকৃত হইত। শিক্ষাবিস্তারেও জমিদারেরা কম সাহায্য করিতেন না। সেকালের পাঠশালা, টোল প্রভৃতি তাঁহাদের সাহায্যেই চলিত। একালেও বহু ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহাদের অর্থসাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক কথায় জমিদারেরা ছিলেন

---

* Report of the Revenue commission of Bengal, 1940

প্রাচীন হিন্দু সমাজের ধুরন্ধর। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহর যখন গড়িয়া উঠিল, তখন জমিদারেরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবও জমিদারদের গ্রামত্যাগের অন্যতম প্রধান কারণ। সহরে আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসের মোহে তাঁহারা অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং বিলাসময় ব্যয়বহুল জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে অনেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বহু জমিদারের সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিকাইয়া গেল, অনেকের সম্পত্তি ২।৪ বিঘা লাখেরাজ জমিতে মাত্র পর্য্যবসিত হইল। তাঁহাদের প্রাচীন গ্রাম্যজীবনের ধারা লুপ্ত হইয়া গেল, গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্কও ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলার হিন্দু জমিদারদের এই "সহরাভিযান" আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও উহার জের পুরাদমে চলিতেছে। ইহার ফলে একদিকে জমিদারেরা লোপ পাইতে বসিয়াছে, অন্যদিকে গ্রাম্য হিন্দুসমাজও সাধারণভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জমিদারদের যেটুকু প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল, বাঙ্গলার বর্ত্তমান শাসকগণের নূতন নীতির ফলে তাহাও নিঃশেষ হইবে, আশঙ্কা হয়। ইহার উপর যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়া যায়, তবে হিন্দু জমিদারসম্প্রদায় একেবারে উৎখাত হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোক কর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের যে গুরুতর ক্ষতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পক্ষান্তরে জমিদারী প্রথার যে অনেক দোষ আছে, বর্ত্তমান যুগে উহা নানা কারণে টিকিতে পারেনা, ইহা আমরা জানি। এই জমিদারী প্রথার জন্য বাঙলার বহু লক্ষ টাকার মূলধন নিষ্ফলভাবে জমিতে আটক হইয়া আছে, ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত হইয়া জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না। তার পর এই প্রথার ফলে কতকগুলি অলস, বিলাসী, চরিত্রহীন, অকর্ম্মণ্য

লোকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে অধিকাংশ প্রাচীন বনিয়াদী হিন্দু জমিদার বংশের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। কিন্তু এই প্রথা উঠিয়া গেলে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনে যে একটা ওলটপালট হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই, কেননা ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই গত কয়েক শতাব্দীতে বাঙ্গলার গ্রাম্যজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কি উপায়ে সেই প্রতিক্রিয়া রোধ করা যাইতে পারে, অন্য কোন নূতন ভিত্তির উপর সমাজজীবনকে গড়া যাইতে পারে কিনা, এখন হইতেই তাহা চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, দেশে নূতন নূতন শিল্পবাণিজ্য প্রবর্ত্তন ও গঠনের দিকে হিন্দু ভদ্রলোক ও জমিদারদের এখন হইতেই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব ভোগের মোহ তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। সময় থাকিতে প্রস্তুত না হইলে তাঁহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। আরও আশঙ্কার কথা, বর্ত্তমান শাসকগণ যে সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করিতেছেন, তাহাও হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের বিলোপে সহায়তা করিবে। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের কর্ণধারদের এইরূপ কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে কিনা জানিনা, কিন্তু যেভাবে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাপূর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে।

হিন্দু ভদ্রলোক—২

হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও এক কারণে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিলাসিতাও তাহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের standard of life বা "জীবিকার মান" কৃত্রিমভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের হিন্দু ভদ্রলোকগণ যেরূপ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, সহরের 'চাকুরীয়া' ভদ্রসম্প্রদায় এখন তাহা কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন। এইভাবে পাশ্চাত্য বিলাসিতা ও জীবনযাপন প্রণালীর অনুকরণ করিতে গিয়া শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসম্প্রদায় জীবনসংগ্রামে আরও হাবুডুবু খাইতেছে। পাশ্চাত্য অর্থনীতির ভাষায় ইহা হয়ত সভ্যতার উৎকর্ষ। কিন্তু আমরা চোখের উপর দেখিতেছি এবং মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি যে, একদিকে বেকার সমস্যার প্রাদুর্ভাব, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার অনুকরণ এই উভয় কারণে হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিতেছে।

এইরূপে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রাম করিবার ফলে হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের ক্ষয় ক্ষতি অনিবার্য্য। তাহাদের মধ্যে জীবনী-শক্তিহীনতা এখনই দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতে বুদ্ধিরও মালিন্য ঘটিবে এবং ইহার ফলে সমগ্রভাবে হিন্দুসমাজেরও ক্ষতি হইবে, কেননা এখন পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এই ভদ্রসম্প্রদায়ই রক্ষা করিতেছে। ইহাদের পরাজয় বা বিলোপে বাঙালী-জাতিরও অধোগতি হইবে সন্দেহ নাই।

হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে আরও যে সব প্রতিকূল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তন্মধ্যে প্রধান দুই একটির উল্লেখ করিব। প্রথমত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলে মেয়েদের বিবাহের বয়স অত্যধিক বাড়িয়া যাইতেছে। বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী আমরা নহি। কিন্তু যেখানে ছেলেদের বিবাহের বয়স ৩৫।৪৫ এবং মেয়েদের ২৫।৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত উঠে, সেখানে যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক হ্রাস হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার সমূহ কারণ আছে। আর্থিক অবস্থার দোহাই দিয়া ছেলেদের মধ্যে আজকাল অনেকে বিবাহও করিতে চায় না। অবশ্য, বেকার সমস্যা যেখানে প্রবল সেখানে বিবাহে এরূপ অনিচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেরা যেখানে উপার্জ্জনক্ষম, সেখানেও তাহারা যদি জীবিকার একটা কৃত্রিম ষ্টাণ্ডার্ড বা মান লইয়া বিবাহের ব্যাপারে বিচার করে, তবে অবস্থা অচল হইয়া উঠে। আমরা জানি, আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিতেছে। যদি এরূপ দৃষ্টান্ত ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে তাহার পরিণামস্বরূপ অনেক মেয়েও অবিবাহিতা থাকিতে বাধ্য হইবে এবং সমাজের উপর নানাদিক দিয়াই তাহার প্রভাব অনিষ্টকর হইবে।

অধুনা Birth Control বা জন্মনিয়ন্ত্রণের যে ধূয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলেও শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের অনিষ্ট হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি। কোন কোন সমাজতত্ত্ববিৎ এবং অর্থনীতিবিৎ বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে,—বর্ত্তমানে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটির উপর, আগামী আদমসুমারীতে উহা নিশ্চয়ই ৪০ কোটিতে দাঁড়াইবে। এই বিপুল লোকসমষ্টিকে পোষণ করিবার শক্তি ভারতবর্ষের নাই। অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যা উহার পক্ষে বিপদের কারণ হইয়া

দাঁড়াইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ করিয়া অন্যান্য সভ্যদেশ এই সমস্যার সমাধান করিতেছে, ভারতবর্ষই বা তাহা পারিবে না কেন? যাঁহারা এই শ্রেণীর যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে চাই যে, ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার জীবিকার সমাধান কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্যান্য স্বাভাবিক উপায়েও সম্ভব। দেশের সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয়, উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ প্রচুর হয়, সেই দিক দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। মাদ্রাজের অধ্যাপক ডাঃ টমাস এইরূপ মত পোষণ করেন। ডাঃ জ্ঞানচাঁদ যদিও জন্মশাসনের কিয়দংশে পক্ষপাতী, তবুও তিনি মনে করেন যে, দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনিষ্টকারিতা বহুল পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে। জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি হইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারও স্বাভাবিকভাবে নিয়মিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এদেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রচলিত করা প্রায় অসম্ভব। তাহাদিগকে এ বিষয়ে মোটামুটি শিক্ষা দিতে হইলেও অন্তত ৫০ বৎসর লাগিবে। যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাও সকলের ভাগ্যে ঘটে না, সে দেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিবার কি ব্যবস্থা হইতে পারে? দরিদ্র জনসাধারণ প্রয়োজনীয় ঔষধ যন্ত্রাদিই বা পাইবে কোথা হইতে? কিন্তু ইতিমধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কাহারা? শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়। একেই ইহাদের সংখ্যা কমিতেছে, তাহার উপর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে ইহারাই আরও হ্রাস পাইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যাহারা মানিয়া লইবে না, সেইসব শ্রেণীর, বিশেষভাবে মুসলমান জনসাধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যাহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর, সেই হিন্দু ভদ্রলোক

সম্প্রদায় যদি সংখ্যায় হ্রাস হয় এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যদি অত্যধিক বাড়িয়া যায়, তবে তাহার ফলে সমাজের অপকর্ষ ঘটিবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ হীন হইবে এবং জাতি হিসাবে আমরা আরও অযোগ্য হইয়া পড়িব। যাঁহারা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এইসব কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘোর পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার "বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী" গ্রন্থে জন্মনিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙ্গলার মুসলমান ও নিম্নজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে বহুপ্রজনন ও বংশবৃদ্ধি হইতেছে, অপর পক্ষে উচ্চজাতির হিন্দুদের মধ্যে জন্মের হার কম হওয়াতে উহারা ক্ষয় পাইতেছে। উভয় স্তরের লোকদের মধ্যে বংশবৃদ্ধির এই বৈষম্য হেতু বাঙ্গলার সমাজজীবনে ঘোর বিপর্য্যয় ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব মুসলমানদের মধ্যে এবং নিম্নজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে জন্মশাসনের নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধির জন্য রাধাকমল বাবুর এই উদ্বেগ, তাহারা তাঁহার পরামর্শে কদাপি কর্ণপাত করিবে না। পক্ষান্তরে যে উচ্চজাতির হিন্দুদের ক্ষয় হইতেছে, রাধাকমল বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাহারা আরও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। তাহা ছাড়া, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, রাজবংশী ব্যতীত, অন্যান্য নিম্নজাতির হিন্দুদের যে অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি হইতেছে, এই ধারণা সত্য নহে, পূর্ব্বে ইহা আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং ঐ সব নিম্ন জাতির হিন্দুদের মধ্যেও জন্মশাসনের নীতি প্রচার করা আত্মঘাতী নীতিই হইবে।

বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে হিন্দুর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই প্রয়োজন। কেননা ইহারই উপর হিন্দুর শাসনকার্য্যে স্থান তথা আত্মরক্ষার সমস্যা নির্ভর করিতেছে। অতএব যাঁহারা জন্মনিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিতেছেন তাঁহারা ভুল করিতেছেন।*

প্রতিকার কোন পথে

জীববিজ্ঞানের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানের গোড়ার কথাই এই যে, যে-সমাজ পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে না, শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। অনেক প্রাচীন জীবের ন্যায় অনেক প্রাচীন জাতিও এই কারণেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও আরও অনেক জাতি যে জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিবার এই অক্ষমতার জন্য লুপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দুজাতিও সেই পথের পথিক হইবে কিনা নানা কারণে এই প্রশ্ন আজ উঠিয়াছে। আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া টিকিয়া

* বাঙ্গলার হিন্দুরা একেই সংখ্যালঘু। তাহার উপর গত ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নির্ব্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার ফলে, বহু হিন্দু লোকগণনা বর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার ফল অতীব শোচনীয় হইয়াছে—বাঙলার হিন্দুদের সংখ্যা আদমসুমারীর রিপোর্টে প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে আরও কম দেখানো হইয়াছে। আগামী ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে বাঙ্গলার হিন্দুরা পুনরায় ঐরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় যাহাতে না দেয় তাহার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। এই গণতন্ত্রের যুগে লোকসংখ্যার উপরে যখন শাসনক্ষমতা এবং সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তখন বাঙলার হিন্দুদের এসম্বন্ধে বিশেষরূপে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আছি, অতএব ভবিষ্যতেও টিকিয়া থাকিব, এরূপ যুক্তি বালকোচিত। তারপর কোনমতে টিকিয়া থাকাই পরম পুরুষার্থ নহে। একটা জাতি জীবন্মৃত অবস্থায় বহুকাল টিকিয়া থাকিতে পারে, ক্ষয়রোগীও অনেক সময় দীর্ঘজীবী হয়। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান এবং আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন জাতিই তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আর যাঁহারা বলেন, আমরা আধ্যাত্মিক জাতি, 'কৌপীনবন্তং খলু ভাগ্যবন্তং' অবস্থায় জগতের অন্যান্য জড়বাদী জাতিদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিবার জন্যই আমরা বাঁচিয়া আছি—সেই সব মোহগ্রস্ত আত্মপ্রতারকদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করাই নিরর্থক। স্বামী বিবেকানন্দ বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, আমরা যে আধ্যাত্মিকতার বড়াই করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে তামসিকতার লক্ষণ। এই কারণেই হিন্দুজাতিকে স্বামীজী কিঞ্চিৎ রজোগুণের চর্চ্চা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে উপদেশ আমরা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

প্রথমেই বিবেচ্য, পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া যে জাতিভেদের কাঠামোর মধ্যে হিন্দুসমাজ দাঁড়াইয়া আছে, সেই কাঠামো বদলাইবার প্রয়োজন আছে কিনা। আমরা ইতিপূর্ব্বে যেসব কথা বলিয়াছি, তাহাতে অপরিহার্য্যরূপেই এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে, জাতিভেদের কাঠামো ত্যাগ না করিলে হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। জাতিভেদের ফলে হিন্দুসমাজে সংহতিশক্তির অভাব ঘটিয়াছে, সমস্ত সমাজ দানা বাঁধিয়া একই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যে কোন শক্তিশালী 'নেশন' বা মহাজাতি গঠন করিতে পারে নাই, তাহারও কারণ এই জাতিভেদ। ইহা হিন্দুসমাজকে প্রথমত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে বিভক্ত করিয়াছে। উহাদের মধ্যেও আবার বহু উপবিভাগ, শাখা প্রশাখা প্রভৃতির সৃষ্টি

হইয়াছে। কতকগুলি জাতিকে আবার আমরা অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বলিয়া ছাপ দিয়া অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছি। ফলে হিন্দুসমাজ একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজ নয়, বহু বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের সমষ্টি মাত্র, উহাদের মধ্যে কোন নিবিড় যোগসূত্র নাই। এরূপ দুর্ব্বল, সংহতি-শক্তিহীন সমাজ বাহিরের সঙ্ঘবদ্ধ প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে বেশীদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে না। জাতিভেদের আর একটা বিষময় ফল, মানুষকে সে মানুষের মর্য্যাদা দেয় নাই, তাহাকে নানারূপ কৃত্রিম গণ্ডীবদ্ধ করিয়া, বিচিত্র রকমের উচ্চনীচ স্তরভেদ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মদৈন্যের (inferiority complex) সৃষ্টি করিয়াছে। এই আত্মদৈন্য হিন্দুসমাজকে ক্রমশ ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে।

অতএব প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন জাতিভেদের বিলোপ। সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া হিন্দুসমাজদেহে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিতে হইবে, তাহার মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার বিকাশ করিতে হইবে। ভারতের ইতিহাসে কয়েকবার এই চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু নানা প্রতিকূল শক্তির জন্য উহা সফল হইতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের ভিতর দিয়া এই চেষ্টা করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মও এই চেষ্টা করিয়াছিল। কিরূপে উহা ব্যর্থ হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহার আভাস আমরা দিয়াছি। বর্ত্তমান কালে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজও এই চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে করিয়াছে। আর্য্যসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত পাঞ্জাবের 'জাতপাত তোড়কমণ্ডল' এখনও এই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের ভিতর হইতেই যদি ব্যাপকভাবে এইরূপ প্রচেষ্টা না হয়, তবে সাফল্যের আশা কম। স্মরণ রাখিতে হইবে, জাতিভেদ প্রাচীন হিন্দুসমাজের সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ। ইহাকে ধ্বংস করা মোটেই সহজসাধ্য নহে। অতএব কেবল সম্মুখের

দিক হইতে আক্রমণ না চালাইয়া দুই পার্শ্ব হইতে কৌশলে আক্রমণ করাও প্রয়োজন।

আমাদের মতে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন এবং অসবর্ণ বিবাহ—এই দুই আন্দোলন পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ চালাইবার প্রধান উপায়। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বলিয়া কেহ থাকিবে না, সকলেই দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে, কূপতড়াগাদি হইতে জল তুলিতে পারিবে, বিদ্যালয়ে সর্ব্বজাতির হিন্দু একত্র পড়িতে পারিবে—এ সবই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের অঙ্গ। আদমসুমারিতে বিভিন্ন জাতি অনুসারে হিন্দুর নাম থাকিবে না, সকলেই মাত্র 'হিন্দু' বলিয়া উল্লিখিত হইবে, ইহাও একটা উপায়। সরকারী বিধানে 'তপসিলভুক্ত জাতি' বলিয়া যে কৃত্রিম রাজনৈতিক উপবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে, যেরূপেই হোক তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। যদি কোন হিন্দুই 'তপসিল'ভুক্ত হইতে স্বীকৃত না হয়, তবে সহজেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু আমরা যদি তথাকথিত 'তপসিল' ভুক্তদের মনে প্রীতি ও আস্থার ভাব সঞ্চার করিতে না পারি, তবে তাহারা ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইবে কেন?

এইখানেই উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের কথা আসিয়া পড়ে। জাতিভেদ তথা স্তরভেদ ও শ্রেণীবিভাগের ফলে বহু শতাব্দী ধরিয়া উচ্চ ও নিম্ন জাতিদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ ব্যবধান বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই ব্যবধান দূর করিতে হইলে তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দের অভিমান ও ভ্রান্ত মর্য্যাদাবোধ ত্যাগ করিয়া তথাকথিত নিম্ন-বর্ণীয়দের সঙ্গে মিলন মিশ্রণ করিতে হইবে। অনুকম্পা বা পতিতো-দ্ধারের ভাব লইয়া নয়, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার উপর এই মিলনবেদীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হিন্দুতে হিন্দুতে

কোন ভেদ নাই, উচ্চনীচ স্তরবৈষম্য নাই, সকলেই এক হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত—এই মহান্ আদর্শ সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে।

এই মহান্ আদর্শ যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে সংহতিশক্তি বা সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব সঞ্চার করিতে পারে, তাহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমত, সমাজসেবাব্রতী হিন্দু সেবক দল গঠন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুযুবকই এই সেবকদলভুক্ত হইতে পারিবে। ইহাদের মধ্যে উচ্চনীচ স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বা আচরণীয়-অনাচরণীয়ের ভেদ থাকিবে না। তাহারা পরস্পরে একত্রে আহার-ব্যবহার করিবে। তারপর, এমন সব সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে, যাহাতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুই যোগ দিতে পারে। দেবমন্দিরে যদি সকল হিন্দুর প্রবেশ ও পূজার অধিকার স্বীকার করা হয়, তবে এইরূপ সর্ব্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠান সহজ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যেসব "সর্ব্বজনীন পূজা উৎসব" হয়, তাহা এই দিক হইতে খুবই মূল্যবান। এই শ্রেণীর উৎসবের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

অসবর্ণ বিবাহ জাতিভেদের দুর্গ শিথিল করিবার আর একটি প্রধান উপায়। অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে এককালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পাওয়াতে পরবর্ত্তী কালে উহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য উহার বহুল প্রচলন আবশ্যক। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে কেবল যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলন মিশ্রণের ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে তাহা নহে, বিবাহক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে, বিভিন্ন শ্রেণীর রক্তমিশ্রণে হিন্দু সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হইবে। অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে যে আইনের বাধা ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, সুতরাং সমাজহিতকামী ব্যক্তিগণ অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে পারেন।

কিন্তু গোঁড়াদের "ধর্ম্ম গেল" চীৎকার ছাড়াও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের পথে একটা যে প্রবল বাধা আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অসবর্ণ বিবাহের ফলে যে সব সন্তানসন্ততি হইবে, তাহাদের বর্ণ বা জাতি কি হইবে? সহজ বুদ্ধিতে বলে উহারা পিতার বর্ণ বা জাতিই পাইবে। কিন্তু এই হতভাগ্য সমাজে অসবর্ণ বিবাহের ফলেও নূতন নূতন জাতি সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। সেরূপ যাহাতে না ঘটে, সমাজপতিগণকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জাতিভেদ লোপ, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন এবং অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীর আপত্তি উঠিয়া থাকে। এই শ্রেণীর আপত্তিকারিগণ বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈষম্য আছে, তাহা লুপ্ত হইবে, ফলে সমগ্রভাবে হিন্দুসমাজের সংস্কৃতির অপকর্ষ ঘটিবে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতি বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃতি ও সদাচার লাভ করিয়াছে,—নিম্নবর্ণীয়েরা ঐ বিষয়ে অনেক নীচে পড়িয়া আছে। জাতিভেদ লোপ করিয়া অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিলে, উচ্চস্তরের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইবে এবং তাহাতে ঘোর অনিষ্টই হইবে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও খাদ্যবিচার ত্যাগের ফলেও ঐ অবস্থা ঘটিবে। আপত্তিকারীরা আরও বলেন যে, জাতিভেদ কোন না কোন আকারে পাশ্চাত্য সমাজেও আছে, সেখানেও ধনী দরিদ্র, অভিজাত ও সাধারণ লোকের মধ্যে বিবাহ ও আহারব্যবহার প্রচলিত নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর আপত্তিকারীরা ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া যান যে, বংশগত জাতিভেদের বৈষম্য এবং ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-সাধারণের বৈষম্য এক জিনিষ নয়। পাশ্চাত্য সমাজে আজ যে দরিদ্র ও সাধারণ-লোক, দশ বৎসর পরে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রবলে সে-ই ধনী ও অভিজাত হইতে

পারে। সুতরাং সমাজের সকল দ্বারই যে কোন লোকের জন্য অবারিত। বংশগত জাতিভেদের বৈষম্যে ঐরূপ হইতে পারে না। উহাতে কতকগুলি জাতি অন্য দিক দিয়া সহস্র যোগ্যতা লাভ করিলেও নিম্নস্তরেই থাকিয়া যায়, আর কতকগুলি জাতি অযোগ্য হইলেও সমাজের শীর্ষস্থানে উচ্চস্তরে বিরাজ করিতে থাকে। ইহার ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সদাচার, আভিজাত্য ইত্যাদি সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রসারিত হইতে পারে না এবং সমগ্রভাবে সমাজের ক্ষতিই হয়। তারপর জাতিভেদ লোপ এবং অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলেও, যাহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমান সাধারণতঃ এমন সব শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহ ও আহারব্যবহার চলিবে, যেসব সমাজে জাতিভেদ নাই সেখানেও ঐরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক আপত্তিকারীদের হিন্দুসমাজের সংস্কৃতি লোপের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।

প্রতীকার কোন পথে—২

কাশীর বিখ্যাত মনীষী ডাঃ ভগবানদাসের পত্র উপলক্ষ করিয়াই আমরা এই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। সুতরাং হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্গতির প্রতিকারকল্পে ডাঃ ভগবানদাস যে-উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাঃ ভগবানদাস মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ যে বর্ণাশ্রমব্যবস্থার উপর সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি Ideal বা আদর্শ মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর কোন সমাজ উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে যতদিন অবিকৃত ছিল,

ততদিন হিন্দুসমাজে কোন জটিল আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হয় নাই, বেকারের দলও দেখা দেয় নাই। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটা সুসঙ্গত সামঞ্জস্যও ছিল। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যখন হইতে বিকৃত হইয়া জাতিভেদে পরিণত হইতে লাগিল, তখন হইতেই হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। ডাঃ ভগবানদাসের অভিমত এই যে, যদি হিন্দুসমাজে পুনরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমানের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হইবে। যে কর্ম্মবিভাগের নীতির উপর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমানকালে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোন সমাজই তাহা অনুসরণ করে নাই, ফলে ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচের আত্যন্তিক বৈষম্য ঘটিয়াছে। এত দুঃখদৈন্য বেকারসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে উহাই। সমাজতন্ত্রবাদ বা ধনসাম্যবাদ এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য যে সব উপায় চিন্তা করিতেছে, ডাঃ ভগবানদাসের মতে সেই সব উপায়ে সমস্যার সম্যক সমাধান হইবে না। পক্ষান্তরে আর্য্যহিন্দুদের উদ্ভাবিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি নিহিত আছে। ইহাকে এক হিসাবে Practical Socialism বলা যাইতে পারে। হিন্দু সমাজ যদি সেই প্রাচীন আদর্শ গ্রহণ করে, তবে আবার সে পূর্ব্বের গৌরব ফিরিয়া পাইতে পারে।

ডাঃ ভগবানদাস প্রাচীন বর্ণাশ্রমব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যবস্থায় সমাজে শিক্ষক, রক্ষক, পালক ও ধারক এই চতুর্ধা বিভক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের অঙ্গাঙ্গিভাবযুক্ত সহযোগ ও সহকারিতার ফলে সামাজিক স্বস্তি ও সম্পদ সিদ্ধ হইতে পারিয়াছিল।

It was framed by the ancient thinkers of India, who had discovered the greater, nobler, and for the humanity, the far more useful complimentary half-truth and fact of human evolution in accordance with the

great "Law of alliance for existence." (Dire need for a scientist manifesto).

কিন্তু 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' যতই 'আদর্শ' ব্যবস্থা হোক, বর্ত্তমান যুগে হিন্দু সমাজে তাহা ঠিক ঠিক প্রচলিত করা অসম্ভব। যমুনার জল যেমন উজান বহানো যায় না, প্রাচীন যুগের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও তেমনই এ যুগে ফিরাইয়া আনা যায় না।

ডাঃ ভগবানদাস নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—It has obviously degenerated utterly and become curse instead of blessing. অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত ও অধঃপতিত হইয়াছে এবং হিন্দুসমাজের পক্ষে আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিশাপস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাও মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই, এমন কি অভিশাপস্বরূপ হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যবস্থার মারাত্মক দোষ এই যে, ইহাতে সমাজে ধনী দরিদ্রের মধ্যে আত্যন্তিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানের বলে মানুষ ধনসম্পদ বাড়াইবার যে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি কোটিপতি, লক্ষপতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের ভোগবিলাসের আড়ম্বর বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই,—কিন্তু অপরদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্দ্ধাশনে অনশনে রোগে ব্যাধিতে পশুর ন্যায় দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য ক্রমেই বাড়িতেছে, কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য সমাজের সর্ব্বস্তরে ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টিত হইতেছে না। ফলে বিরাট অন্নসমস্যা বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরিয়া সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, কৃষক ও শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করিয়াছে। ডাঃ ভগবানদাসের ভাষায়—Humanity is in imminent danger

of dying from mutual hatred—born of lack of equitable disttribution of sufficient bread.

এই বিদ্রোহের মধ্য হইতেই Socialism and Communism—সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনসাম্যবাদের জন্ম এবং সোভিয়েট রাশিয়া এই সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনসাম্যবাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই বর্ত্তমানে জটিল সামাজিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। ডাঃ ভগবানদাস মনে করেন যে, ভারতের প্রাচীন আর্য্যদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরই সোভিয়েটের এই সাম্যবাদমূলক ব্যবস্থা vast experiment বা সুমহৎ পরীক্ষা হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু এই পরীক্ষার পথে সোভিয়েট রাশিয়া যেমন কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছে, তেমনি আবার কতকগুলি বিষয়ে মারাত্মক এবং নিষ্ঠুর ভ্রমও করিয়াছে—

The vast Russian experiment now in progress, is the second effort of mankind in the same direction; but, while it has achieved marvels, it has also committed many serious and cruel mistakes, is still undergoing great internal tribulations and is correcting its errors.

সেইজন্য ডাঃ ভগবানদাস মনে করেন যে, একদিকে সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনসাম্যবাদ, অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—ইহার মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করিলে কেবল হিন্দুসমাজ নয়, বর্ত্তমান বিশ্বমানব সমাজের সমস্যারও মীমাংসা করা যাইতে পারে। সেই মধ্য পন্থার নাম দিয়াছেন তিনি 'নূতনতর ও উন্নততর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' এবং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদিগকে সেই নূতন পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

The right middle course between impossibly equilatarian communism and criminally iniquitons capitalism,—a new and complete scheme of social structure (a newer and better 'Barnasram-dharma').

ডাঃ ভগবানদাস যে সুসংস্কৃত বৈজ্ঞানিক 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের' কথা বলিয়াছেন, আদর্শ হিসাবে তাহা খুবই উচ্চ সন্দেহ নাই, উহার মূল উদ্দেশ্য আমরাও সমর্থন করি। কিন্তু ঐ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর কিনা বা হইলে কবে সম্ভবপর হইবে, তাহা বলা কঠিন। সুতরাং সেই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকিয়া হিন্দু সমাজের দুর্গতি রোধ করিবার জন্য অবিলম্বেই আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মতে এখন প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য—হিন্দু সমাজের মধ্যে সামাজিক সাম্যবাদ ও কর্ম্মযোগের আদর্শ প্রচার করা এবং সাহসের সঙ্গে তদনুযায়ী সংস্কার প্রচেষ্টা করা। সাম্যবাদের কথা উঠিলেই, কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি মুরুব্বীয়ানার চালে বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যঋষিরা যে সাম্যবাদের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার চেয়ে বড় আদর্শ আর কোথায় আছে? "জীবমাত্রেই ব্রহ্ম"—এই আদর্শ ত হিন্দুদেরই। কিন্তু কেবল প্রাচীন আর্য্যঋষিরা কেন, বুদ্ধদেব, চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষেরাও ত ঐ মহান সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

তবু হিন্দু সমাজের এই দুর্দ্দশা কেন, জাতিভেদ এখনও লুপ্ত হয় নাই কেন, তথাকথিত "শূদ্রেরা" এখনও মানুষের অধিকার পায় নাই কেন? তাহার কারণ, কেবল কথায় চিড়া ভিজে না। মুখে বড় বড় আদর্শের কথা বলিব এবং কার্য্যকালে ভেদ ও বৈষম্যের দুর্গ আরও পাকা করিতে থাকিব, ইহা ভণ্ডামি, আত্মপ্রতারণা, জঘন্য স্বার্থপরতা। সুতরাং হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণীয়দের আজ ভণ্ডামি ছাড়িয়া বাস্তবক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজেদের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত স্বার্থ, দম্ভ ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সমাজের কল্যাণ, তথা নিজেদের কল্যাণের জন্যও তথাকথিত "শূদ্রদের" মানুষের অধিকার দিতে হইবে। শূদ্রশক্তি যতদিন অবজ্ঞাত,

দলিত, পিষ্ট হইয়া থাকিবে, ততদিন হিন্দুসমাজের কল্যাণ নাই, তাহারা উহাকে ক্রমাগত ধ্বংসের পথেই টানিয়া লইয়া যাইবে। "শূদ্রদের" মধ্যে যদি আমরা মনুষ্যত্বের বোধ জাগাইতে পারি, তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতে পারি, তবে তাহাদের মধ্য হইতে যে প্রচণ্ড শক্তি জাগ্রত হইবে, তাহা হিন্দুসমাজে যুগান্তর সৃষ্টি করিবে। বর্ত্তমানে সমাজের শূদ্রশক্তির মধ্যে যে হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ। কিন্তু তাহারা একা মরিবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই মরিব। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা হিন্দুসমাজের কেহ নহে, হিন্দুসমাজের ভাল মন্দে: তাহাদের কিছু আসিয়া যায় না। কতকটা নৈরাশ্যে, কতকটা প্রতিশোধ স্পৃহায় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। যাহারা করিতেছে না, তাহারা মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কৃত্রিম "তপশীলী জাতির" সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতেছেন। অতএব এখনও যদি আমরা সাবধান না হই, তবে ধ্বংস নিশ্চিত।

দ্বিতীয়ত কর্ম্মযোগ ও রজোগুণের আদর্শ প্রচার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্মবিমুখতা এবং একটা তামসিক অহিংসার ভাব হিন্দুসমাজের মধ্যে—বিশেষত তাহার নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ফলে স্ব স্ব বৃত্তিকে তাহারা হীন মনে করিতে শিখিয়াছে। কৃষিজীবী হিন্দুরা যে কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিতেছে, তাহার মূলে কেবল তাহাদের অক্ষমতা নয়, কৃষিকার্য্যের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবও আছে। ফলে হিন্দু কৃষকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইতেছে, সমস্ত জমি মুসলমান কৃষকদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহা হিন্দুসমাজের পক্ষে ঘোর দুর্লক্ষণ। অবস্থা

যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে আর অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই হিন্দুরা ভূমিশূন্য বেকার শ্রমিকের দলে পরিণত হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে কর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে হইবে। হিন্দু কৃষকেরা আবার যাহাতে জমিতে ফিরিয়া যায়, পরিত্যক্ত শ্রমশিল্পগুলি গ্রহণ করে, তাহার জন্য তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। গ্রাম্য কুটীরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে এবং হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণীয়েরা যাহাতে গ্রামে থাকিয়াই ঐ সব শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এটা ত অর্থনৈতিক সমস্যা—ইহার সঙ্গে হিন্দুর সামাজিক সমস্যার সম্বন্ধ কি? কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদেরা জানেন যে, অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব সমাজের উপর কতখানি কাজ করে। কর্ম্মহীন হতাশ বেকারের দল লইয়া কোন সমাজই রক্ষা করা যায় না, হিন্দুসমাজকেও রক্ষা করা যাইবে না।

তারপর রজোগুণের কথা। অহিংসার নামে যে ঘোর তামসিকতা হিন্দুসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে হিন্দুসমাজকে মুক্ত করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। স্বামী বিবেকানন্দ বহু পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দুসমাজকে বাঁচাইবার জন্য চাই রজোগুণ—বীর্য্যবান কর্ম্মের সজীবতা। কিন্তু তাঁহার কথা আমরা ভাল করিয়া শুনি নাই। আর এই অহিংস তামসিকতার সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে—অদৃষ্টবাদ, পরলোক-বিলাসিতা, ইহলোকের প্রতি ঔদাসীন্য। সমস্ত মিলিয়া হিন্দুজাতিকে এমন শান্ত, নিরীহ, বশংবদ non-aggresive ও submissive করিয়া তুলিয়াছে যে বর্ত্তমান যুগের জীবনসংগ্রামে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন। বহু শতাব্দীর পরাধীনতাও হিন্দুদের প্রকৃতিতে এই ভাব দৃঢ়মূল করিয়া দিয়াছে।

জীববিজ্ঞানের দিক হইতে এই Non-aggresiveness বা সবল মনোভাবের অভাব একটা জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যাধি—ক্ষয়রোগেরই তুল্য। বহু প্রাচীন জাতি, প্রাচীন সভ্যতা ইহার ফলে ধ্বংস হইয়াছে। হিন্দুরা যদি সময় থাকিতে এই "পরাজিতের মনোভাব" ত্যাগ করিয়া সবল, সতেজ মনোভাবের অনুশীলন করিতে না পারে, তবে জীববিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে তাহাদেরও অদূর ভবিষ্যতে মৃত্যু হইবে। পৃথিবীতে দুর্ব্বলের স্থান নাই, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—এই মহাসত্য আজ আমাদিগকে জাতি হিসাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

রাষ্ট্র ও সমাজ

সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন প্রধানত দুই উপায়ে হইতে পারে। প্রথমত রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্ট এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন; দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই এই কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হইতে পারেন। এদেশে যখন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল, তখন হিন্দু রাজারা সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন ব্যাপারে বহু ক্ষেত্রেই যে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেসব ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন না, সেখানেও সমাজপতিদের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা তাঁহারা পরোক্ষভাবে অনুমোদন ও সমর্থন করিতেন। ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন সমাজপতি। তাঁহারা সমাজশাসনের জন্য যে সব ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন, তাহা রাজার অনুমোদন ও সমর্থন বলেই সমাজে প্রচলিত হইত। রাজা নিজে যদি কোন সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেন, তাহা হইলেও এই সমাজপতি ব্রাহ্মণগণেরই সহযোগিতা প্রয়োজন হইত।

বৌদ্ধযুগের প্লাবনে হিন্দুর সমাজব্যবস্থার অনেক ওলট পালট হইয়াছিল। যে সব রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের উপর অনেক সময় প্রবল আঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে তাঁহারা একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। পক্ষান্তরে সমাজপতি ব্রাহ্মণেরাও এই সময়ে হাল ছাড়েন নাই। সেই বৌদ্ধ প্লাবনের মধ্যেও তাঁহারা প্রাচীন ব্যবস্থা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কতকগুলি স্মৃতিশাস্ত্র যে বৌদ্ধযুগের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধযুগের অবসানে যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জাগরণ হইল, তখন সমাজশাসনের জন্য আবার নূতন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইল। হিন্দু রাজারা যে এই সময়ে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে উৎসাহ সহকারে যোগ দিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য আছে।

কিন্তু হিন্দুরাজত্বের অবসানে এদেশে যখন মুসলমান শাসন আরম্ভ হইল, তখন হইতেই রাষ্ট্রের সঙ্গে হিন্দুসমাজের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইল। মুসলমান শাসকেরা দেশ শাসন করিতেন, কিন্তু হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিন্দুসমাজ এ বিষয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল। ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ও প্রচলিত অনুশাসন অনুসারে সমাজশাসন করিতেন। প্রয়োজন হইলে নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়া নূতন বিধান দিয়া তাঁহারাই সমাজসংস্কার করিতেন। মুসলমান যুগে বাঙলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সংস্কারক বা স্মৃতিকাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন। মুসলমান যুগে হিন্দু সমাজের বন্ধন যখন শিথিল হইতে আরম্ভ হইল, এমন কি কোন কোন দিক দিয়া তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইল, তখন স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনই যুগোপযোগী নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়া হিন্দু সমাজবন্ধন অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসাধারণ মনীষাপ্রভাবে

তৎকালীন হিন্দুসমাজ তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধান মানিয়া লইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, গত চারিশত বৎসর কাল হিন্দুসমাজ রঘুনন্দনের ব্যবস্থাই অল্পবিস্তর মানিয়া আসিতেছে। রঘুনন্দনের সমাজবিধান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিয়াই, আজকাল অনেকে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন, এমন কি বাঙলার হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রকার দোষক্রটির দায়িত্ব তাঁহার উপরেই চাপাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর সমালোচকেরা রঘুনন্দনের উপর ঘোর অবিচারই করিয়া থাকেন। রঘুনন্দনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক হিন্দুসমাজের অবস্থা জানা প্রয়োজন। কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, সমাজের কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য তিনি নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রঘুনন্দনের সমাজব্যবস্থার বিচার করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝা হইবে। তৎকালীন সমাজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, মুসলমান যুগে হিন্দু সমাজের রক্ষণ ও সংস্কারের জন্য স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন যে বিরাট কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি যে অভ্রান্ত ছিলেন, অথবা তাঁহার সমস্ত ব্যবস্থাই সুফল প্রসব করিয়াছে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁহার নিকট বাঙলার হিন্দুসমাজের ঋণ যে অপরিশোধ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুত, রাষ্ট্রের কোনরূপ সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে এবং হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেভাবে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন—তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল।

কিন্তু রঘুনন্দনের পর, তাঁহার তুল্য শক্তিশালী আর কোন স্মৃতিকার

বাঙলা দেশে আবির্ভূত হয় নাই। বাঙলার হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিও হ্রাস হইয়াছে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, রঘুনন্দন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙলা দেশের হিন্দুসমাজের জন্য যে সব বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এখনও সেইগুলিই আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি। অথচ ইংরেজ শাসনের আমলে অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ও সজ্ঘর্ষে আমাদের জীবনধারা আমূল বদলাইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। অতএব চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত সেই সব প্রাচীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা আর নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের দোহাই দিয়া, সনাতনী সাজিয়া যতই আমরা চীৎকার করি না কেন, বাস্তব সত্যকে ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হইতেছে না।

হিন্দুসমাজের ব্যাধির মূল এইখানে। প্রাচীন বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও সংস্কার অপরিহার্য্য—আত্মরক্ষার জন্যই অপরিহার্য্য। কিন্তু এই সমাজসংস্কার কোন্ শক্তিবলে সম্ভবপর হইবে? ব্রাহ্মণদের সেই পুরাতন পদমর্য্যাদা ও শক্তি আর নাই। তাঁহাদের মধ্যে রঘুনন্দনের মত প্রতিভাশালী মনীষীও আর দেখা যাইতেছে না। মুসলমান শাসকদের ন্যায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও আমাদের সামাজিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আইন দ্বারা সমাজ সংস্কার করিতে তাঁহারা সম্মত নহেন। তৎসত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; যথা—সতীদাহ প্রথা ও গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা নিবারণ, চড়ক গাছে ঝুলিয়া আত্মনিগ্রহের প্রথা নিবারণ ইত্যাদি। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সব ক্ষেত্রেই সাধারণ নৈতিক আদর্শ ও মানবিকতার দিক হইতেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দেশবাসীর পক্ষ

হইতে রাজা রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও আন্দোলন করিয়া গবর্ণমেণ্টের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতেই সংস্কারপন্থীরা আইন প্রণয়নের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের দরবারে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন ; যথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন এবং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় সিভিল বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে ডাঃ গৌড়ের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহ আইন এবং শ্রীযুত হরবিলাস শারদার চেষ্টায় বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন প্রভৃতিও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ না করিলেও পরোক্ষভাবে এই সব সমাজ সংস্কারমূলক আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রাচীনপন্থী সনাতনী হিন্দুরা আইন দ্বারা এইরূপ সমাজসংস্কারের ঘোর বিরোধী। তাঁহারা বলেন, আমরা পরাধীন জাতি, দেশের শাসন ব্যাপার বিদেশী শাসকদের হাতে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও সমাজের দিক দিয়া এখনও আমরা অনেকটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আছি। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি আইন দ্বারা সমাজসংস্কার করিবার অস্ত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিই, তবে আমাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে। যদি সমাজসংস্কার করিতেই হয়, আমরা নিজেরাই করিব, তাহার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইব কেন ?

প্রাচীনপন্থী সনাতনীদের এই যুক্তির মধ্যে কতকটা সত্য আছে, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। দেশশাসনের দিক দিয়া আমরা আজও স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন লাভ করি নাই সত্য, কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসনের কিছু ক্ষমতা আমাদের হাতে আসিয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে যেটুকু প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত

হইয়াছে, তাহাতে ব্যবস্থাপরিষদে প্রেরিত দেশবাসীর প্রতিনিধিদের সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আইন প্রণয়নের অধিকার আছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যদেরও এরূপ অধিকার আছে। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে অথবা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদে হিন্দুসমাজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি কোন সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেন, তবে তাহার ফলে আমাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে, এরূপ কথা বলা যায় না। প্রাচীনপন্থীরা ঐরূপ সংস্কার পছন্দ না করিতে পারেন, কিন্তু সমাজের অগ্রগামী সংস্কারপন্থীরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হন, তবে প্রাচীনপন্থী সনাতনীদের উহাদের মত মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ভারতের উন্নত দেশীয় হিন্দু রাজ্যসমূহে যে আইন দ্বারা সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা আমরা সকলেই জানি। বরোদা, মহীশূর, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর, গণ্ডাল প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য এ বিষয়ে অগ্রণী। এই সব রাজ্যে প্রতিনিধিপরিষদ বা আইনপরিষদ আছে এবং রাজারা সাধারণত আইনপরিষদের মধ্য দিয়া সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রবর্ত্তন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজা প্রতিনিধিদের উদ্যোগেও এইরূপ আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণবিবাহ প্রবর্ত্তন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, পণপ্রথা নিবারণ এইভাবে আইন দ্বারা ঐ সব রাজ্যে করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুররাজ সর্ব্ববর্ণের হিন্দুদের মন্দিরপ্রবেশের অধিকার দিয়া যে আইন করিয়াছেন, তাহাও সকলে অবগত আছেন। এইসব দেশীয় রাজ্যে হিন্দুসমাজ ঐরূপ সমাজ সংস্কারমূলক আইন মানিয়া লইয়াছেন। কোন কোন স্থলে গোঁড়া সনাতনীরা আপত্তি তুলিয়াছে বটে, কিন্তু জনমত তাহাদিগকে সমর্থন করে নাই।

এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া আমরা কতকগুলি ক্ষেত্রে আইন দ্বারা সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী। কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে,

কেবলমাত্র আইন দ্বারা সর্ব্বক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের সংস্কার করা সম্ভবপর নয়, সমাজদেহের সমস্ত ব্যাধিও উহার দ্বারা দূর করা যায় না। কতকগুলি ব্যাপারে আইন দ্বারা সংস্কারসাধন আদৌ সম্ভবপর নয়,—যেমন জাতিভেদ লোপ বা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। কোন আইনই এ ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইতে পারে না। আরও অনেক আচার, প্রথা, লোকাচার ও দেশাচার আছে, যাহা বহু শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। যেরূপ কঠোর আইনই করা যাক না কেন, সেই সমস্তকে উহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, কোন একটা আইন করিলেই চলিবে না; যদি উহার পশ্চাতে জনমত না থাকে, তবে ঐ আইনের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বাল্য বিবাহ নিবারণ আইন হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের সপক্ষে জনমত এখনও প্রবল না হওয়াতে ঐ দুই সংস্কার আশানুরূপ সফল হইতে পারিতেছে না।

অতএব সমাজসংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন করিতে হইলে প্রথমত একদল জ্বলন্ত বিশ্বাসী নেতা ও কর্ম্মীর প্রয়োজন। প্রাচীন সমাজে ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা যে স্থান অধিকার করিতেন, তাঁহাদিগকে কতকটা সেই স্থান অধিকার করিতে হইবে। ইঁহাদিগকে সমাজের সর্ব্বস্তরে সংগঠন ও প্রচারকার্য্যের ভার লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, এজন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন। হিন্দুসমাজের কল্যাণকামী চিন্তাশীল মনীষী, কর্ম্মী সংস্কারপন্থীদের লইয়া কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে এবং তাহার অধীনে দেশের সর্ব্বত্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে। হিন্দু মহাসভার ন্যায় প্রতিষ্ঠান এইরূপ কার্য্য করিবার যোগ্য পাত্র। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানকে বিশেষভাবে সমাজসংস্কার ও সংগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, অথবা এই সব কার্য্যসাধন করিবার জন্যই আর একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সমাজ ও সাহিত্য

সমাজসংগঠন ও সমাজসংস্কার করিবার অন্যতম প্রধান অস্ত্র সাহিত্য ও শিল্পকলা। সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়া যে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, রাষ্ট্রের আইন বা সংস্কারপন্থীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্য্যের চেয়ে তাহা কোন অংশেই কম নহে, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী। সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়া প্রচারিত ভাব ও আদর্শ জাতির মনোরাজ্যে বিপ্লব আনয়ন করে, মানুষের জীবনধারার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। রাজনৈতিক আন্দোলন বা জাতীয় আন্দোলনে সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভাব ইতিহাস পাঠকেরা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ফরাসীবিপ্লবের, এমনকি আধুনিক রাশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে সাহিত্য যে কত বড় শক্তি যোগাইয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই জানি। অথচ সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন ব্যাপারেও সাহিত্যকে সেইরূপ মর্য্যাদা দিতে আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করিতে পারে যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচারিত যে ভাব ও আদর্শ রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিতে গড়িতে পারে, জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে প্রভাবিত করিতে পারে, সমাজসংস্কার ও সংগঠনের ব্যাপারেও সেই শক্তি অশেষ কার্য্য করিতে পারে।

জাতীয় আন্দোলন এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনের উপর সাহিত্যের প্রভাব যে কত বেশী বাঙলাদেশেই তাহার বড় দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের উপর রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সাহিত্য বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ

সংস্কার আন্দোলনের উপরও তেমনি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যে সমাজসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা প্রধানত বাংলা সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ—রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি প্রধানত সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সংস্কার আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা যে সমাজসংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে সামাজিক জড়তা ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁহারা অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই। হিন্দুসমাজ উহাতে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের শক্তি ও তেজ যে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, উহা আশানুরূপ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজ একটা বিষয়ে মারাত্মক ভুল করিয়াছিল। তাহারা হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বাহির হইতে সংস্কার আন্দোলন চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার ফলেই হিন্দুসমাজের সহানুভূতিলাভে তাহারা বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য বহুদিন পূর্ব্বেই ধরিতে পারিয়াছিলেন। "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার" নামক তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হইয়াছে, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আর প্রয়োজন নাই। বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই উহার পক্ষে বাঁচিবার একমাত্র পথ। জানি না, ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ এ সত্য এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন কিনা। পাঞ্জাবের আর্য্যসমাজ এই ভুল করে নাই, তাই তাহাদের শক্তি ক্রমেই বাড়িতেছে।

বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজের ভিতর হইতেই যাঁহারা সমাজসংস্কার আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। বলিতে গেলে হিন্দুসমাজের নবযুগের স্মৃতিকাররূপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রাচীন স্মৃতিকারদের চেয়ে তাঁহার গৌরব কোন অংশেই কম নহে। তাঁহার দুই প্রধান সংস্কার প্রচেষ্টা—বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবারণ বহুল পরিমাণে সাফল্যলাভ করিয়াছে। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রধানত সাহিত্যের মধ্য দিয়াই এই সংস্কার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক যে সব সাহিত্যিক কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, সমাজ সংস্কারের দিক দিয়া তাঁহাদের প্রভাবও সামান্য নহে। পণ্ডিত রামনারায়ণের "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক এবং দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক নাটক ও প্রহসন এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্মাও" বাঙলার সামাজিক আন্দোলনে স্থান পাইবার যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহার সমসাময়িক সাহিত্যিকবৃন্দ সমাজসংস্কার আন্দোলনের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন—তথা সমাজজীবনকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে আমরা কতকটা বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের তীব্র আলোকে আমাদের চোখ ঝলসিয়া গিয়াছিল। ফলে যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহাই আমরা নকল করিয়া নিজেদের সত্তা হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিলাম। এই বিমূঢ় অবস্থা হইতে জাতিকে যাঁহারা সচেতন করিয়া তোলেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে

সর্ব্বাগ্রগণ্য। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে তিনি যেমন পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, অগাধ হিন্দুশাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্যেও তেমনি ছিল তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তিনি স্বজাতি ও সমাজকে আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে দৃষ্টি বহির্ম্মুখী হইয়াছিল, তাহাকে তিনি অন্তর্ম্মুখী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর তাঁহার অসামান্য প্রতিভা সাহিত্যের মধ্য দিয়াই এই দুঃসাধ্য ব্রত পালন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ—তাঁহার শিষ্য ও সহকর্ম্মীরাও এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

তারপর আসিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে করিয়াছিলেন আরও মহীয়ান, গৌরবোজ্জ্বল। বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের হিন্দু-সমাজকে তিনিই নূতন করিয়া দিয়াছিলেন—কর্ম্মযোগ ও সেবাধর্ম্মের শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ প্রচলিত ভাষায় 'সাহিত্যিক' ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার বিরাট মনীষার স্পর্শে এক বিশাল নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী বাঙ্গলাভাষার মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজদেহে বিদ্যুৎসঞ্চার করিয়াছে।

এই যুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যাঁহারা সমাজসংস্কার আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানত সাহিত্যকেই অবলম্বন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাবলীর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "অপরাজেয় কথাশিল্পী" শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়াই উপন্যাস লিখেন নাই বটে, কিন্তু যে সব

ভাব ও আদর্শ তিনি তাঁহার সৃষ্ট কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাঙালী হিন্দুর সমাজজীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চও হিন্দুর সমাজজীবনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। বাঙ্গলার নাট্যশালার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নহে, এখনও একশত বৎসর হয় নাই। কিন্তু নানা বিচিত্র অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ আমাদের সামাজিক পরিবর্ত্তনে বিপুল শক্তিসঞ্চার করিয়াছে। এক্ষেত্রে বাঙ্গলার সংবাদ পত্রের দানও সামান্য নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর যত কিছু সমাজসংস্কার আন্দোলন, তাহার অধিকাংশেরই বাহন ছিল বাঙ্গলার সংবাদপত্র। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলন, তাহার জাতীয়জীবন যেমন সংবাদ পত্রের নিকট ঋণী, হিন্দুর সমাজসংস্কার আন্দোলনও তেমনি সংবাদ পত্রের নিকট কম ঋণী নহে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন প্রধানতঃ সংবাদ পত্রের মধ্য দিয়াই পরিচালিত হইয়াছে। সংবাদ পত্র "সাহিত্যের" অন্তর্ভুক্ত কিনা সেই 'চুলচেরা' তর্ক আমরা তুলিব না, তবে বাঙ্গলা সংবাদপত্র যে বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সহযোগী একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

সমাজ ও সাহিত্য—২

এইবার অতি-আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিব। তরুণেরা এই সাহিত্যের নানা বিচিত্র মনোহর নাম দিয়া থাকেন। যথা—অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্য, যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্য, সাম্প্রতিক সাহিত্য ইত্যাদি। কিন্তু নামগুলি যতই গালভরা বা শ্রুতিমধুর হউক না কেন, জিনিষটা আসলে কি? এই সাহিত্য কি জাতিকে কোন মৌলিক বলিষ্ঠ চিন্তার সন্ধান দিতে পারিয়াছে, অথবা সমাজকে কোন উন্নততর আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের সঙ্ঘর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন বাঙলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শক্তি ছিল, তেজ ছিল, চিন্তার মৌলিকতা ও সজীবতা ছিল, একটা বলিষ্ঠ পৌরুষের ভাব তাহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য কেবল চিন্তার মৌলিকতা বা সজীবতার দিক হইতেই নিকৃষ্ট নহে,—একটা অবসাদগ্রস্ত, অতৃপ্ত ভোগবিলাসকামী, পৌরুষহীন, নিস্তেজ মনের শোচনীয় বিকাশ ইহার মধ্যে দেখিয়া জাতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা হতাশ হইয়া উঠি। এই অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা নিজেদের বাস্তববাদী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত অত্যধিক আদর্শবাদী ভাববিলাসী বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু দেশ ও জাতির রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, এমন কি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে এই নূতন সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আলোকলতার যেমন মূল নাই, শূন্যে ঝুলিয়া থাকে, এই অতি-আধুনিক সাহিত্যও তেমনি

সমসাময়িক জীবন হইতে যেন কোন রসধারা সংগ্রহ করিতে পারে না। পরাধীনতার জ্বালা, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অগণিত নরনারীর দারিদ্র্যপূর্ণ দুর্ব্বহ জীবনভার, প্রাণহীন সমাজের অশেষ গ্লানি ও নৈরাশ্য—অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে এই সমস্তের কোন প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই কি? এই সাহিত্যে যে সমস্ত নরনারীর চিত্র অঙ্কিত হয় তাহারা এ দেশের বা সমাজের নয়,—তাহাদের চিন্তা, ভাবনা, চরিত্রের সঙ্গে আমাদের চারদিককার পরিচিত নরনারীর কোন মিল নাই। ইহাদের পরিকল্পিত "বালিগঞ্জ সমাজ" বৈষ্ণবদের "মানস বৃন্দাবনের" মত কল্পনা ও ভাববিলাসের রাজ্যেই বর্ত্তমান। একথা কেহ অস্বীকার করে না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দু সমাজ যেখানে ছিল, এখন আর সেখানে নাই, কালচক্রের আবর্ত্তনে আমরা বহু দূর চলিয়া আসিয়াছি। আমাদের সম্মুখে আজ জীবনসংগ্রাম কঠোরতর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, নূতন নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, পৃথিবীর চারিদিক হইতে নানা বিচিত্র চিন্তা ও ভাবের তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে আঘাত করিতেছে। যদি অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে এই সমস্ত সমস্যার ছায়াপাত দেখিতাম, ঐ গুলির সম্মুখীন হইবার একটা প্রচেষ্টা এইসব নবীন লেখকদের রচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিত, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইতাম। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ আমরা এই সাহিত্যে দেখিতে পাই না।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে এইসব অতি-আধুনিক লেখকদের উদ্ভট ও অস্বাভাবিক কল্পনার মূল উৎস কোথায়, এই সব কৃত্রিম ও অবাস্তব নরনারীর চিত্র কোথায় ইহারা পাইল? ইহার সন্ধান করিতে হইলে গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশে সমাজ ও সভ্যতার

একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যে সত্য ও নীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কঠোর নির্ম্মম আঘাতে তাহার ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে মানুষের জীবপ্রকৃতির আবরণ খুলিয়া গিয়া উহা একেবারে নগ্ন হইয়া পড়িল। নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে যে আদিম যৌনপ্রবৃত্তি এতকাল কতকটা সুপ্ত ও সংযত ছিল, নীতির বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উহা উচ্ছৃঙ্খল বীভৎস মূর্ত্তিতে দেখা দিল। ইউরোপীয় যুদ্ধোত্তর সাহিত্য এই উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, বিপর্য্যস্ত সমাজেরই চিত্র অঙ্কনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। ঐরূপ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে সমস্ত সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এই নূতন সাহিত্যে তাহারই ছায়াপাত হইয়াছিল। যে সব নরনারী এই নূতন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে তাহারাই প্রধান অভিনেতা। আমাদের দেশের অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা ইউরোপের এই যুদ্ধোত্তর সাহিত্যেরই নকল করিয়া বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আসলে ও নকলে যে প্রভেদ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্য যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সমাজের বাস্তব চিত্রই আঁকিয়াছিল,—ঐ সাহিত্যের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নরনারীরা নিছক কল্পনা রাজ্যের প্রাণী নহে, সত্যকার জীবন ও চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এ দেশের সাহিত্যে যখন ঐ সব নরনারীর চিন্তা, চরিত্র ও জীবন সমস্যার আমদানী করা হইল, তখন উহা উদ্ভট অস্বাভাবিক কাল্পনিক চিত্র মাত্র হইয়া দাঁড়াইল। ঐ সব নরনারীও আমাদের সমাজে নাই, তাহাদের সমস্যাও আমাদের নহে। তাই যে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম নগ্ন পশুপ্রবৃত্তির চিত্র আমরা অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে দেখি, তাহাতে ঘৃণায় শিহরিয়া উঠি, নিজের অন্তরেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। যদি

মিথ্যা ও অবাস্তব বলিয়া একেবারে ফুৎকারে হাওয়ায় উড়াইয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর এই সাহিত্য লইয়া এমন উদ্বেগের কারণ ঘটিত না। কিন্তু মিথ্যা ও অবাস্তবেরও একটা মোহিনী শক্তি আছে, মানুষের আদিম পশুপ্রকৃতিকে উহা প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। ফলে সমাজ ও পরিবারের উপর উহার অনিষ্টকর প্রভাব ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচির বিকৃতি ঘটে। অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য তাই আমাদের নিকট আশঙ্কার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সাহিত্য সমাজকে উন্নততর আদর্শ প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, উহাকে নীচের দিকে টানিয়া লইবারই চেষ্টা করিতেছে। বাঙলার হিন্দুসমাজের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা নহে।

ছায়াচিত্র—লোকসাহিত্য

বর্ত্তমানে বাঙলার নাট্যসাহিত্য প্রাণহীন, রঙ্গমঞ্চের অবস্থাও শোচনীয়; জাতীয় জীবন বা সামাজিক জীবনের উপর তাহার প্রভাব অতি সামান্য। ইদানীং বাঙলায় কোন প্রথম শ্রেণীর নাটকও রচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে রঙ্গমঞ্চকে আচ্ছন্ন করিয়া সিনেমা বা ছায়াচিত্র এদেশে প্রসারলাভ করিতেছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে সিনেমার বিশেষ প্রভাব ছিল না। কিন্তু এখন আর ইহার প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গত বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে, বিশেষত বোম্বাই ও বাঙলায় একটা বৃহৎ সিনেমাশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমেই ইহার শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং এই নূতন শক্তিকে উপেক্ষা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। বরং কিভাবে এই নূতন শক্তিকে দেশ ও সমাজের কল্যাণসাধনে

নিয়োজিত করা যায়, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশসমূহে সিনেমা কেবল আমোদপ্রদ নহে, শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের সহায়ও বটে। আমাদের দেশেও যদি আমরা সিনেমাশিল্পকে ঐরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি, তবেই উহার সার্থকতা হইবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে এদেশে সিনেমার মধ্য দিয়া যে সব ভাব ও আদর্শ প্রচারিত হইতেছে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশ ও সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। এই সব সিনেমার বিষয়বস্তু দেখিয়া মনে হয়, যাঁহারা এই সব বিষয়ের পরিকল্পনা করেন, দেশের সঙ্গে বা সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই। এই সব ছবির নায়কনায়িকারা কিম্ভূতকিমাকার জীব, তাহাদের রুচি বিকৃত, জীবন ও চরিত্র অস্বাভাবিক, এ দেশের বিরাট প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে তাহাদের কোনই যোগ নাই। বস্তুতঃ বাঙলা ছবিতে এদেশের সত্যকার জীবনের স্পর্শের একান্ত অভাব। ইহারা বাঙলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে রূপ উদ্‌ঘাটিত করে, কোথায়ও তাহার অস্তিত্ব নাই। বিগত শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার 'ইঙ্গবঙ্গ' সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল বটে। কিন্তু ঐ সমাজের অস্তিত্ব এখন বিলুপ্তপ্রায়, যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা প্রাগৈতিহাসিক জীবের ন্যায় সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট কৌতূহলের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বাঙলা দেশের ছায়াচিত্রগুলি সেই বিস্মৃতপ্রায় কিম্ভূতকিমাকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজকেই অতীতের গর্ভ হইতে টানিয়া তুলিয়া যেন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ যে স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, আধুনিক বাঙলা সিনেমা তাহাকে

জীয়াইয়া তুলিবার এই অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে কেন? আমাদের মনে হয়, ইহার কারণ, বাঙ্গালী সিনেমা শিল্পী ও প্রয়োগ-কর্ত্তারা স্বদেশ ও স্বজাতির মর্ম্মস্থলের সন্ধান পান নাই। তাঁহাদের নিজস্ব কোন ভাব ও আদর্শ নাই, পাশ্চাত্য সিনেমার নিকৃষ্ট অনুকরণই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন। বিশেষত সিনেমা নাট্য যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, তাঁহাদের না আছে সাহিত্যিক প্রতিভা, না আছে নাট্যরসবোধ। সুতরাং ইঁহারা সকলে মিলিয়া শিব গড়িবার বদলে যে বানর গড়িবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

ফলে সিনেমাশিল্প আমাদের সমাজজীবনের উপর ঘোর অনিষ্টকর প্রভাবই বিস্তার করিতেছে। ইহা ভাব ও আদর্শের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে, রুচি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করিতেছে। একটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক জীবনের মোহ বিষের ন্যায় ধীরে ধীরে সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইতেছে। এই সর্ব্বনাশা মোহের প্রভাব হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

সিনেমা শিল্পের ন্যায় আধুনিক সঙ্গীত ও নৃত্যকলাও হিন্দুর সমাজ জীবনের উপর কম অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে না। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব দেখিয়া পরম পুলকিত। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে, এ কি কম গৌরবের কথা? কিন্তু হায়, অন্য দিকে বাঙ্গালীরা যে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহা তাঁহাদের খেয়াল নাই! সঙ্গীত ও নৃত্যকলা জাতীয় বা সামাজিক মনের বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ইহা আমরা স্বীকার করি, কলাশিল্প হিসাবেও উহাদের স্থান উচ্চে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গীত

ও নৃত্যকলার নেশা বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলেমেয়েদের যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা আমরা কখনই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করিতে পারি না। বরং অতিরিক্ত সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রবণতা বাঙ্গালী হিন্দুর চরিত্র-দৌর্ব্বল্য এবং অধোগতিরই সূচনা করিতেছে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়। তারপর বাঙ্গালী হিন্দুর আধুনিক সঙ্গীতে যে তথাকথিত "নূতন সুরের" কথা আমরা শুনিতে পাই, সে জিনিষটা আসলে সাঁওতালী সুর ও জংলী মেঠো সুরের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা সঙ্গীত কলায় বাঙ্গালীর উন্নতির পরিচয় নহে, অবনতিরই পরিচয়। বাঙ্গালী হিন্দুরা যে তথাকথিত আধুনিক নৃত্যকলার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া জাঁক করা হয়, তাহার মধ্যে বীর্য্য ও সবল প্রাণের ছন্দের একান্ত অভাব। বরং জাতীয় চরিত্রের বিকৃতি ও অবসাদের লক্ষণই উহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই শ্রেণীর সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কোন জাতির মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতে পারে না, একটা ক্লৈব্য ও অবসাদের ভাবই আনিয়া দেয়।

আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, ছায়াচিত্র লইয়া কতকগুলি অপ্রিয় সত্য বলিলাম। তাহার কারণ আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্য ও শিল্পকলা জাতীয় জীবন তথা সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যদি আমরা ঐ সব শক্তিকে সুপরিচালিত করিতে পারি, তবে জাতিগঠন এবং সামাজিক সমুন্নতির ধারাকেও উহার ভিতর দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। কিঞ্চিৎ আশার লক্ষণ, আধুনিক সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের মধ্যে অতি অল্পদিন হইল একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহাদের মনের গতির যেন মোড় ফিরিয়াছে, অতি-আধুনিক 'কন্টিনেণ্টাল' বা ইউরোপ সাহিত্যের ব্যর্থ অনুকরণ না করিয়া তাঁহারা স্বদেশ ও স্ব-সমাজের বাস্তব সমস্যা লইয়া নূতন ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা "ঠেকিয়া শিখিয়া" বোধ হয় বুঝিয়াছেন

যে, এদেশ নরওয়ে, সুইডেন, বিলাত, রাশিয়া বা আমেরিকা নহে; বিশ্বের কর্ম্মপ্রবাহ ও ভাবপ্রবাহের সঙ্গে আমাদের যোগ থাকিলেও আমাদের সমাজের স্বতন্ত্র সমস্যা আছে এবং তাহার সমাধানের উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। কয়েকজন শক্তিমান নবীন লেখকের মধ্যে আমরা এই ভাব লক্ষ্য করিতেছি। যদি তাঁহাদের মতিস্থৈর্য্য ও আদর্শনিষ্ঠা থাকে, তবে নবযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য ও শিল্পকলা সমাজের উপর কল্যাণকর প্রভাবই বিস্তার করিবে।

* * * *

আমরা এতক্ষণ যে সাহিত্য ও শিল্পকলার সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, তাহা প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের শিক্ষিতদের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, উহার নীচের স্তরে সঞ্চারিত হইবার তেমন সুযোগ পায় না। তাহার কারণ, হিন্দু সমাজের শতকরা ৯০ জন লোকই নিরক্ষর; অশিক্ষিত এবং শতকরা যে দশজনকে "লেখাপড়া জানা" বলিয়া ধরা হয়, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশই "অল্পশিক্ষিত", এমন কি কেহ কেহ নাম দস্তখত করা ছাড়া লেখাপড়ার আর কিছুই জানে না। এই অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বিশাল হিন্দু জনসাধারণের নিকট আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য ও নাট্যকলা প্রভৃতি হয়, অপরিজ্ঞাত নয় দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং ইহাদের মনের উপর প্রভাববিস্তার করিবার উপায় কি, তাহা আজ আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

সেকালের হিন্দুসমাজেও নিম্নস্তরের জনসাধারণ নিরক্ষর ও অশিক্ষিতই ছিল। প্রাচীন সমাজপতিরা এই 'শূদ্রজাতিকে' অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে যেমন দাবাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্যও তেমনি কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সেকালের সমাজে লোক-শিক্ষার অন্য নানা ব্যবস্থা ছিল, যাহার দ্বারা কতকটা ক্ষতিপূরণ হইত।

প্রথমত, সেকালের বাঙলা সাহিত্য ছিল প্রকৃতপক্ষে লোক সাহিত্য,—দেশীয় ভাব ও আদর্শ লইয়াই তাহা রচিত হইত। উহা পড়িয়া অল্প শিক্ষিতেরাও বুঝিতে পারিত এবং 'অশিক্ষিত'দের বুঝাইতে পারিত। বৈষ্ণব পদাবলী, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীরামের 'মহাভারত', কবি কঙ্কণের 'চণ্ডীকাব্য', ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি এই শ্রেণীর সত্যকার লোকসাহিত্য ছিল। তার পর যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, পুরাণপাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়াও হিন্দুসমাজের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে উচ্চভাব ও নৈতিক শিক্ষা প্রচারিত হইত। তখনকার দিনে সমাজসংস্কারের ঐগুলিই ছিল বড় উপায়। কিন্তু আধুনিক বাঙলা সাহিত্য যেমন 'লোক সাহিত্যের' স্থান গ্রহণ করিতে পারিতেছে না,—যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতি প্রায় উঠিয়া যাওয়াতে, লোক শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের এই সব সহজ পথও রুদ্ধ হইয়াছে। কিরূপে অল্প শিক্ষিতগণেরও বোধগম্য প্রকৃত 'লোকসাহিত্য' রচিত হইতে পারে, আধুনিক সাহিত্যিকদের তাহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি প্রাচীন ধরণে পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে কি না সন্দেহ। তবে চেষ্টা করিলে ঐগুলিকে নব-রূপান্তরিত ও আধুনিক যুগোপযোগী করা যাইতে পারে। আর আধুনিক যুগের রেডিও, সিনেমা, ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতিকে যদি আমরা লোকশিক্ষার কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হইলে অনেকটা ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। সংবাদ পত্রকেও অল্পশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে সমাজসংস্কারমূলক প্রচার কার্য্যের দায়িত্ব অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদপত্র এ যুগে লোকশিক্ষার অন্যতম প্রধান বাহন সন্দেহ নাই।

সমাজসংস্কারে নারীর স্থান

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান খুব উচ্চে, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আজকাল আমরা খুবই ব্যগ্র, সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া আমরা পরম গর্ব্বভরে বলি—

'যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা'।

আর প্রাচীন ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষার যে খুব চমৎকার ব্যবস্থা ছিল, ইহাও প্রমাণ করিতে বসিয়া যাই,—গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতির নাম করি; 'কন্যাপেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ'—মনুর এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অবিশ্বাসীদের তাক লাগাইয়া দিই।

প্রাচীন ভারতের প্রতি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা আছে। হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব আমরাও অনুভব করি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অতীব দুঃখের সঙ্গে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থার যে রঙ্গীন চিত্র আমরা আঁকিয়া থাকি, তাহা অনেকাংশেই বাস্তব সত্য নহে। প্রাচীন বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের "স্বপ্নরাজ্যের" কথা ছাড়িয়া দিলে, ঐতিহাসিক মধ্যযুগে তথা আধুনিক যুগে দেখিতেছি, হিন্দু সমাজে নারীকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তির চেয়ে বেশী মূল্য দেওয়া হয় নাই। তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে অসহায় ও পরবশ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বরং বহির্জ্জগতের সঙ্গে যাহাতে তাহার সম্বন্ধ না ঘটিতে পারে, সেইজন্য অবরোধ

প্রথার আমদানী করা হইয়াছে। 'সতীদাহের' কথা উঠিলে এখনও আমাদের শরীরে রোমাঞ্চ হয়। মাত্র এক শতাব্দী পূর্ব্বেও 'সতীদাহ' পরম পবিত্র হিন্দুশাস্ত্র সম্মত বলিয়া গণ্য হইত এবং আইনের ভীতি না থাকিলে এখনও ঐ উপায়ে পুণ্যসঞ্চয় করিতে আমরা দ্বিধাবোধ করিতাম না। প্রাচীন শাস্ত্রে বিধবার জন্য তিনটী পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল,—ব্রহ্মচর্য্য, বিধবাবিবাহ এবং সতীদাহ। কিন্তু অর্ব্বাচীন যুগের হিন্দুসমাজ তন্মধ্যে 'সতীদাহকেই' প্রাধান্য দিয়াছিল। এই প্রথা যে আদিম বর্ব্বর যুগের এবং ইহার সঙ্গে নারীকে সম্পত্তিরূপে গণ্য করিবার মনোভাব জড়িত, এই অপ্রিয় সত্য কথাটা কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বিধবা বিবাহ নিষেধও অল্পবিস্তর এই ভাবের সঙ্গে জড়িত। স্বামীর মৃত্যু হইলেও স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারিবে না, কেন-না স্বামীর সঙ্গে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ,—ইহার সরল অর্থ, স্ত্রী স্বামীর অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পর্য্যায়ভুক্ত। নতুবা স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুর পর, এমন কি স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতেও যতবার ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে, সেখানে ইহলোক ও পরলোকের কোন প্রশ্নই উঠিবে না, অথচ নারীর জন্যই যত কিছু বিধি নিষেধ, ইহার অর্থ কি?

অপহৃতা ও বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা নারীদের প্রতি হিন্দুসমাজ যে হৃদয়হীন ব্যবহার করে, তাহার মূলেও নারীর প্রতি হীনতাসূচক এই নিকৃষ্ট মনোভাব। অপহৃতা নারীকে রক্ষা করিবার মত ক্ষাত্রবীর্য্য বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ হইতে যে পরিমাণে লোপ পাইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই যেন অপহৃতা ও নিগৃহীতা নারীদিগকে সমাজ হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করিবার প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপহৃতা ও বলপূর্ব্বক নিগৃহীতা নারীদের প্রতি জগতের কোন মনুষ্যসমাজ এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না। আমরা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিই, কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই দিয়াও

এই অপকার্য্য সমর্থন করা যায় না। কেন না স্মৃতিকারেরা বলপূর্ব্বক অপহৃতা ও নিগৃহীতা নারীকে সমাজে গ্রহণ করার জন্য উদার ব্যবস্থাই দিয়াছেন। হিন্দুসমাজের হৃদয়হীনতার ফলে কত নিরপরাধিনী নারী যে এইভাবে সমাজ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া বিধর্ম্মীর অঙ্কশায়িনী হইতে বাধ্য হইয়াছে, কত নারী যে পতিতা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা ভাবিতেও মন গভীর বিষাদভারাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং হিন্দুসমাজের ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা হয়। যে সমাজ নিজেদের নিরপরাধিনী নারীর সম্বন্ধে এই আত্মহত্যাকর নীতি অবলম্বন করিতে পারে তাহার কল্যাণ কোথায়?

হিন্দু নারীকে যে আমরা সমাজে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দিই না, তাহার অন্যতম প্রমাণ, নারীদের পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার নাই। জীবিত কালের জন্য গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকার মাত্র তাহার আছে। ফলে বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে সর্ব্ব অবস্থাতেই নারীকে পরাধীন হইয়া থাকিতে হয়। মনুও অবশ্য সেই ব্যবস্থা দিয়াছেন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'। এ বিষয়ে হিন্দু নারীর চেয়ে মুসলমান নারীদের মর্য্যাদা ও অধিকার যে অনেক বেশী, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

তার পর বাল্যবিবাহ প্রথা। এই প্রথা হিন্দুসমাজের অর্দ্ধাংশ নারীকে যে দেহ ও মনে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে, একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। একদিকে অবরোধপ্রথা, অন্য দিকে বাল্যবিবাহ এই দুইয়ে মিলিয়া হিন্দুনারীদের মধ্যে অকালমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। হিন্দুর সূতিকাগারের সঙ্গে নানারূপ লোকাচার ও দেশাচার মূলক কুসংস্কার ও কুপ্রথা জড়িত। বাল্যমাতৃত্বের সঙ্গে এই কুসংস্কার মিলিয়া প্রসূতিমৃত্যুর সংখ্যা যেরূপ ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে, বোধ হয় কোন সমাজে তাহার তুলনা নাই। হিন্দু নারীদের মধ্যে প্রসূতি মৃত্যুর কোন পৃথক হিসাব পাওয়া যায় না, কিন্তু নিম্নে প্রসূতিমৃত্যুর

যে হিসাব দেওয়া হইল, (ভারত গবর্ণমেণ্টের মেডিক্যাল সার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার জেনারেল স্যার জন মীগের হিসাব মতে) তাহার মধ্যে হিন্দু নারীদের একটা বড় অংশ যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রসূতি মৃত্যুর হার (হাজার করা)—(১৯৩৩)

আসাম	২৬·৪০
যুক্তপ্রদেশ	১৮
মধ্যপ্রদেশ	৮·১৮
মান্দ্রাজ	১৩·২৪
বাঙ্গলা	৪০·১৬
বিহার উড়িষ্যা	২৬.৮৭
পাঞ্জাব	১৮·৭৩
বোম্বাই	২০
সমগ্র ভারতে (গড়ে)	২৪·০৫

বিলাতে প্রসূতি মৃত্যুর হার হাজার করা ৪ জন মাত্র এবং উহাও কমাইবার জন্য প্রবল চেষ্টা হইতেছে।

হিন্দুনারীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্যও লক্ষ্য করবার বিষয়! বাল্যমাতৃত্ব এবং অবরোধপ্রথা যে ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা দেশে হিন্দুসমাজে নারীর সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে এবং উহার ফলে হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। হিন্দু নারীর এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ কি? হিন্দুজাতির জীবনীশক্তিহ্রাস যে ইহার একটা প্রধান কারণ, এরূপ সন্দেহ করিবার হেতু আছে। আমাদের মনে হয়, হিন্দুসমাজে কন্যাসন্তানের প্রতি অনাদর ও উপেক্ষাও

ইহার আর একটা প্রধান কারণ। যে সমাজ কন্যাসন্তান চায় না, তাহার প্রতি অনাদর ও উপেক্ষা করে, জীবতত্ত্বের নিগূঢ় নিয়মে সে সমাজে কন্যার সংখ্যা কম হইবেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও সিন্ধুর হিন্দুসমাজ কন্যাসন্তানের প্রতি ঘোর অনাদর করিত, এমন কি শিশুকালে কন্যাকে বিষ খাওয়াইয়া বা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিত। ইংরাজ আমলে ঐ নৃশংস প্রথা আইন বলে বন্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু গোপনে এখনও উহা চলিয়া থাকে। ফলে ঐ সব প্রদেশে হিন্দুদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম, অনেক পুরুষ বিবাহই করিতে পারে না, ভিন্ন প্রদেশ হইতে নানা উপায়ে কন্যা সংগ্রহ করিতে হয়। কাশ্মীরে নারীর সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে, কাশ্মীর দরবার সম্প্রতি আইন করিয়াছেন যে, প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ কন্যাসন্তানকে সযত্নে পালন ও রক্ষা করিবার জন্য দায়ী থাকিবে। ইহার কোন ব্যতিক্রম হইলে আইনতঃ দণ্ড হইবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্ট কন্যাসন্তানের পালন ও রক্ষা করার জন্য অভিভাবকদিগকে অর্থ সাহায্য করিবেন।

ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। বাঙলা দেশের হিন্দুসমাজে নারীর সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, তাহাও প্রকৃতির প্রতিশোধ বলিয়া মনে হয়। হিন্দুর গৃহে কন্যার প্রতি যে ভাবে অনাদর ও উপেক্ষা করা হয়, কন্যার বিবাহ দিবার জন্য পিতামাতাকে যেরূপ দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়, এমন কি অনেক সময় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাতে হিন্দুসমাজে কন্যার সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

নারীদের শিক্ষার প্রতি বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে ভাবে উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহা

সমাজের পক্ষে মোটেই গৌরবের বিষয় নহে। মেয়েরা লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, এ ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় বাঙলা দেশে স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ হয়। তার পর অবশ্য হিন্দুসমাজের নেতা ও সংস্কারকেরা স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির নাম এক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলনও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে হিন্দুসমাজের সংস্কারপন্থী নেতারা আরম্ভ করেন।

কিন্তু নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার আন্দোলন এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই সমধিক প্রবল হইয়াছে এবং কিয়দংশে সফলও হইয়াছে। প্রথমে স্বদেশী আন্দোলন, তারপর মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনই ইহার জন্য গৌরব করিতে পারে। গত বিশ বৎসরে বাঙলা দেশে হিন্দুসমাজে নারীশিক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, অবরোধ-প্রথা কিয়দংশে দূর হইয়াছে, নারীরা সাধারণের কাজে যোগ দিতে শিখিয়াছেন।

কিন্তু বাঙলার বিরাট হিন্দুসমাজের তুলনায় এই নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার আন্দোলন কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে? বলিতে গেলে সমাজের উপরের স্তরে—ভদ্রলোকদের মধ্যেই এই আন্দোলন কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। হিন্দু সমাজের শতকরা ৯৫ জন নারী এখনও অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমগ্ন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সংস্কার আন্দোলন যে হিন্দুনারীদের এই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের পাষাণ প্রাচীরে আসিয়া ঠেকিয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? হিন্দুসমাজের পুরুষেরা শিক্ষায় সংস্কৃতিতে যতই অগ্রসর হোক, যতই

বড় বড় সমাজসংস্কারের কথা তাহারা বলুক, যতদিন সমাজের অর্দ্ধাংশ নারীরা তাহাতে সহযোগিতা না করিতেছে, ততদিন কোন সংস্কারই সফল হইতে পারিবে না। দিদিমা, পিসীমা, মাসীমা, জেঠাইমার দল চিরদিন আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। অতএব হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, সমাজকে নবযুগের উপযোগী করিয়া নূতন ভাবে গড়িতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে নারীদিগকে সেজন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। এ কাজের ভার শিক্ষিতা নারীরা যদি স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সব চেয়ে ভাল হয়। কিঞ্চিৎ আশার কথা, শিক্ষিতা নারীরা আজকাল বহু সভাসমিতি ও সম্মিলন গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং নারীদের মধ্যে নানাদিকে সংস্কার আন্দোলন চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র এখনও সহরের মুষ্টিমেয় ভদ্র পরিবারের নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে, হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে সহরের বাহিরে গ্রামে যে বিশাল নারী-সমাজ আছে, তাহাদের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করিতে হইবে। তবেই নারী আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে সফল হইতে পারিবে।

প্রাচীন যুগে যাহাই হোক, বর্ত্তমান যুগে হিন্দুসমাজ নারীকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দেয় নাই,, তাহার মনুষ্যত্বের দাবীকে পূরাপূরি স্বীকার করে নাই। ফলে নারী আজ হিন্দুসমাজের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু নারীকে আজ আমরা তাহার প্রাপ্য স্থান দেই, তবেই হিন্দুসমাজের পক্ষে জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হইবে।

পারিপার্শ্বিক ও সমাজ

একটা জাতি যে রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, তাহা তাহার সামাজিক জীবনের উপর বহুল প্রভাব বিস্তার করে, এই ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে বিতর্কের অবসর নাই। ভারতবর্ষে হিন্দুজাতিকে গত তিন হাজার বৎসরে বহু বিচিত্র রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে। প্রবল বিদেশীর আক্রমণ, রাজা ও রাজ্যের পরিবর্ত্তন, রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব প্রভৃতি বহুবারই হইয়াছে। আর এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে যে হিন্দুজাতির সামাজিক জীবনেও বহু ওলটপালট হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতের কোন সুসম্বদ্ধ ইতিহাস নাই, নতুবা এই সামাজিক পরিবর্ত্তনের ধারা সুস্পষ্টরূপে অনুসরণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলেও, উহার বহু নিদর্শন এখনও অনুসন্ধান করিলে সমাজদেহে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

দীর্ঘকালের রাজনৈতিক পরাধীনতা যে হিন্দুর সমাজজীবনের উপর নানাদিক দিয়া ঘোর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার ফলে হিন্দুসমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথে নানা প্রবল বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত, মনুষ্যত্ব নিপীড়িত হইয়াছে, তেজ ও বীর্য্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধোগতি হইয়াছে। এমন দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিলে একটা জাতি ও সমাজের পক্ষে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনাই বেশী, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ যে আজও লুপ্ত হয় নাই, সে কেবল তাহার পিতৃপুরুষের পুণ্যের ফলে অর্থাৎ তাহার বনিয়াদ শক্ত ছিল বলিয়া।

কিন্তু অতিবড় শক্ত বনিয়াদও বাহিরের প্রবল আঘাতে ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতে থাকে এবং অবশেষে তাহার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ সেই পরিণতির দিকে চলিয়াছে কি না, তাহা বিশেষভাবে চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক পরাধীনতা কিভাবে হিন্দুর জাতীয়জীবন এবং সমাজজীবনের উপর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহার একটা প্রধান দৃষ্টান্ত,—ইংরেজ আমলে আইনের বলে ভারতবাসীরা নিরস্ত্র হইয়াছে। দেশরক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ ও অধিকার তাহারা পায় নাই। জাতির যুবকদিগকে সামরিক শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয় না। সরকারী প্রয়োজনে অল্পসংখ্যক ভারতবাসী সৈন্যদলভুক্ত হয় বটে, কিন্তু সকল প্রদেশের লোক, এমন কি সকল সম্প্রদায়ের লোক সেই সুযোগও সমানভাবে পায় না। উহার মধ্যেও 'সামরিক' ও 'অ-সামরিক শ্রেণীভেদ আছে। যেমন বাঙ্গালীরা 'অ-সামরিক' জাতি। ফলে যে বাঙ্গালীরা দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যুদ্ধনিপুণ জাতি ছিল, তাহারাই আজ যুদ্ধবিমুখ ভীরু জাতি বলিয়া অপবাদগ্রস্ত। বাঙ্গালী হিন্দুর প্রতি এই লজ্জাকর বিশেষণগুলি বিশেষভাবেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আর একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইনবলে কৃত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। ইহার ফলে ভারতের হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদবিভেদের সৃষ্টি হইয়া এক মহাজাতি গঠনের পথে প্রবল বাধা জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ফলে সমগ্রভাবে ভারতের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলার হিন্দুদের যে ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, তাহাই আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙলা দেশে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে ব্যবস্থাপরিষদে মুসলমানদের স্থায়ী সংখ্যাগুরুত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং কার্য্যতঃ যাঁহাদের হাতে শাসনভার পড়িয়াছে,

তাঁহাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধি সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন। ইঁহারা এমন সব আইন বিধি নিয়ম প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেছেন, যাহার ফলে বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি, এমন কি অর্থনৈতিক জীবনও বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। গত দুই শতাব্দী ধরিয়া বাঙলার হিন্দুরা শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা দ্বারা বাঙ্গালা জাতির যেটুকু অগ্রগতি সাধন করিয়াছিল, আশঙ্কা হয়, তাহা বহুদূর পিছাইয়া যাইবে। এমন কি, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে জাতির প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা যে বড় দান—বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, তাহারও অগ্রগতি ব্যাহত ও গৌরব হ্রাস হইবে,—এই দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির ফলে আরবী ও পার্শীবহুল একটা তথাকথিত 'মুসলমানী' বাঙলা ভাষা' সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে এবং সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও পাঠ্য বোর্ড উহাতে প্রশ্রয় দিতেছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষা সংস্কৃতি তথা বাঙলা ভাষার এই অধঃপতনে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি, এমন কি সমগ্র ভারতীয় জাতিও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য ও দূরদর্শিতা শাসনযন্ত্রের বর্ত্তমান কর্ণধারদের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অঙ্গচ্ছেদও উল্লেখযোগ্য। লর্ড কার্জ্জন বাঙলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাঙ্গালী জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলেন। সাত বৎসরের আন্দোলনের ফলে লর্ড কার্জ্জনের সেই অপচেষ্টা নিবারিত হইয়াছিল,—বাঙ্গলাদেশ আবার জোড়া লাগিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার সমস্ত অংশকে আমরা ফিরিয়া পাই নাই। মানভূম, সিংহভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙ্গলার একটা বৃহৎ অংশ কাটিয়া লইয়া বিহারের অঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলার আর একটা বৃহৎ অংশ—শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ঐ সব বিচ্ছিন্ন অংশ ম্যালেরিয়ামুক্ত ও

স্বাস্থ্যকর, খনিজ সম্পদপূর্ণ। সুতরাং মৈনাকের পক্ষচ্ছেদের মত বাঙ্গলার এইভাবে অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে স্বাস্থ্য ও অর্থ সম্পদের দিক দিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বিশেষভাবে ক্ষতি হইয়াছে বাঙ্গালী হিন্দুর। কেননা ঐ সব অঞ্চল বাঙ্গলাদেশের মধ্যে থাকিলে বাঙ্গালী হিন্দু এমন 'সংখ্যালঘু' হইত না। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুকে সংখ্যালঘু করবার জন্যই যেন বাঙ্গলার এইভাবে অঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছে। কেননা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিধানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশের সীমানার এমনভাবে কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না, যাহার ফলে বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের কোন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুকে স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু করিয়া রাখাই যেন শাসকদের নীতি। বাঙ্গালী হিন্দুকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে এই নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অবসান ঘটাইতে হইবে এবং বাঙ্গলার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে বাঙ্গলার মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

সুতরাং রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে একটা জাতি বা সমাজের প্রকৃতি ও চরিত্রের যে আমূল পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা তো আমরা চোখের উপরই দেখিতেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। জাতির রাজনৈতিক পরাধীনতা যে তাহার সাহিত্য ও শিল্পকলার অবনতির কারণ সৃষ্টি করে, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। সাহিত্য ও শিল্পকলা স্বাধীন ও সবল মনের ভিতর দিয়াই পূর্ণবিকাশের সুযোগ পায়। স্বাধীন গ্রীস, রোম, স্বাধীন হিন্দুভারত সর্ব্বত্রই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। আধুনিক-কালেও পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যেই সাহিত্য ও শিল্পকলা পূর্ণ-বিকাশ লাভের সুযোগ পাইয়াছে। এই সাহিত্য ও শিল্পকলা যে আবার সমাজজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাতির রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাহার

জাতীয় চরিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক সমুন্নতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা একথাও বলিবেন যে, জাতীয় চরিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা জাতির রাজনৈতিক অবস্থার উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একটা জাতির চরিত্র যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার সাহিত্য ও শিল্পকলার অধোগতি হয়, সমাজ ব্যবস্থা নির্জ্জীব ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে, তখন ঐ সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ রাজনৈতিক পরাধীনতা ঘটিয়া থাকে। গ্রীস ও রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইউরোপের অতি আধুনিক ইতিহাসেও আমরা তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। সেদিন জার্ম্মানীর হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মার্শাল পেতাঁ বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সের জাতীয় চরিত্রের অবনতিই যুদ্ধে তাহার পরাজয়ের কারণ। আমাদের এই ভারতবর্ষেও এবিষয়ে প্রভূত দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় রহিয়া গিয়াছে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুভারতের যে সবদিক দিয়াই অধোগতি হইয়াছিল, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? রাজারা তখন মদনোৎসবে ব্যস্ত, যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। কালিদাস 'রঘুবংশে' অগ্নিবর্ণ রাজার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, উহাই তখনকার হিন্দু রাজাদের আসল চিত্র। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে তখন ভারত বিভক্ত। কাহারও একক আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না, আবার উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবার মত মনোবৃত্তিও ছিল না। ফলে পাঠান আক্রমণে একে একে সকলেই বিধ্বস্ত হইল। গজনীর মামুদ অষ্টাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। ইতিহাসে যখন সেই বিবরণ পড়ি, তখন লজ্জায় মাথা হেট হয়, হিন্দুজাতিকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে।

হিন্দুজাতি যদি সজীব থাকিত, তবে সুদূর আফগানিস্থান হইতে পেশোয়ারের গিরিবর্ত্ম ভেদ করিয়া মুষ্টিমেয় পাঠান সৈন্য লইয়া গজনীর মামুদের পক্ষে পুন পুন ভারত লুণ্ঠন করা কখনই সম্ভবপর হইত না। সোমনাথ মন্দিরের লুণ্ঠন কাহিনী পড়িয়া মনে হয়, এদেশে তখন মানুষ ছিল না। তার পর মহম্মদ ঘোরীর ভারতবিজয়। একটা জাতির চরিত্রহীনতা ও সামাজিক অধঃপতন না ঘটিলে ঐরূপ রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। বিশেষভাবে বাঙলার ইতিহাস আলোচনা করিলেও এইরূপ দৃষ্টান্তই দেখা যায়। বাঙ্গালীজাতির চারিত্রিক অবনতি এবং সামাজিক অধঃপতন না হইলে বক্তিয়ার খিলিজীর পুত্র কখন বাঙলা জয় করিতে পারিত না। পলাশীর যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের বিকৃতি এবং সামাজিক দুর্গতি চরমে উঠিয়াছিল, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে?

সুতরাং একদিকে রাজনৈতিক পরাধীনতা যেমন জাতীয় চরিত্র, শিল্প ও সাহিত্যের অবনতি, সামাজিক অধঃপতন প্রভৃতির কারণ সৃষ্টি করে,—অন্যদিকে তেমনি জাতীয় চরিত্র, শিল্প ও সাহিত্যের অবনতি, সামাজিক অধঃপতনও আবার রাজনৈতিক পরাধীনতাকে ডাকিয়া আনে। এগুলির কোনটি আগে কোনটি পরে? কোনটি কারণ কোনটি কার্য্য? ইহার সঠিক উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, এসবই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ, পরস্পরের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিলে জাতি তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, তাহার সামাজিক দুর্গতি ঘটে,—আবার জাতীয় পরাধীনতার ফলে জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়া থাকে, সামাজিক অধোগতিও হয়।

ব্যক্তির প্রভাব

এই গোলকধাঁধা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? সমাজ ও সভ্যতার মূল শক্তি কি? মানুষ, না, তাহার পারিপার্শ্বিক (environment)—কাহার প্রভাব বেশী? একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষই মূল শক্তি। সে-ই সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করে, পারিপার্শ্বিক তাহাকে সহায়তা করে মাত্র। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সামান্য নয় বটে, কিন্তু মানুষ তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এমন কি তাহাকে অতিক্রমও করিতে পারে। আর একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবই বেশী। যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহাই মানুষের প্রকৃতিকে গঠিত করে, তাহার কার্য্যকলাপ উহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছা করিলেই মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করিতে পারে না, বরং অনেক সময় তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আধুনিক আর একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মতে —এই উভয় মতই আংশিকভাবে সত্য, পূর্ণ সত্য নহে। মানুষ পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং উহারই সাহায্যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করে বটে; কিন্তু মানুষের সৃষ্ট সেই সমাজ ও সভ্যতাই আবার নূতন পারিপার্শ্বিকরূপে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ মানুষ যেমন সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার সৃষ্ট সেই সমাজ ও সভ্যতাও তেমনি আর একদিক দিয়া মানুষকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। এইভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া মানুষ ও তাহার সৃষ্ট সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র সর্পিলগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই শেষোক্ত মতই যে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মধ্য হইতেও একটা সত্য সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। যতই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটুক না কেন, শক্তির প্রধান কেন্দ্র মানুষই। নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাহারই আছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তাহার কর্ম্মশক্তির দ্বারাই চালিত হয়। সভ্যতার ধারাকে সেই পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কোন জাতির মধ্যে যদি অধিক সংখ্যায় প্রতিভাবান, শক্তিশালী, কর্ম্মী মানুষের আবির্ভাব হয়, তবে সে জাতির অগ্রগতি সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে কোন জাতির মধ্যে যদি প্রতিভাশালী, কর্ম্মী, চরিত্রবান লোকের অভাব ঘটে, তবে সে জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের মূল অনুসন্ধানে এই সত্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসবাদ ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটা প্রধান কারণ। সমাজের শ্রেষ্ঠ মেধাবী ও চরিত্রবান ব্যক্তিরা যখন সংসার ত্যাগ করিয়া দলে দলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার ভার পড়িল নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের হাতে। তাহার অনিবার্য্য পরিণাম রাষ্ট্র ও সমাজের অধঃপতন। মানবসমাজের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসে অবশ্য এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই যে, মাত্র একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী নেতা বা মহাপুরুষের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা সমগ্র জাতি শক্তিশালী ও উন্নত হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ মহাপুরুষ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই বিরল।

আজ যে হিন্দুসমাজের এই দুর্গতি হইয়াছে, আমাদের মতে তাহার মূল কারণ, যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিভাবান কর্ম্মী, নেতৃত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব। আধুনিককালে বাঙলা দেশের হিন্দুসমাজের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সঙ্ঘর্ষের ফলে

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার হিন্দুসমাজে একদল প্রতিভাশালী, কর্ম্মশক্তি-সম্পন্ন লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রভাবে হিন্দুসমাজে একটা নব জাগরণের ধারাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু আশঙ্কা হয়, ঐ ধারা শেষ হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙলার হিন্দুসমাজে প্রতিভা, মেধা ও চরিত্রের অবনতি ঘটিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানকালে হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—মেধাবী, চরিত্রবান, বীর্য্যবান মানুষ গড়িয়া তোলা। ইহা একটা অসম্ভব কল্পনা নহে। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে, এই শ্রেণীর মানুষ তৈরী হইতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বা মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্য আকস্মিক ঘটনা, কোন সমাজই ফরমাইজ দিয়া সেরূপ মানুষ তৈরী করিতে পারে না। তাঁহারা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। কিন্তু সাধারণ বীর্য্যবান, চরিত্রবান, কর্ম্মী মানুষ তৈরী করা সম্ভবপর এবং সেই শ্রেণীর মানুষই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে পারে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, হিন্দুসমাজের আজ যে শোচনীয় দুর্গতি, তাহাতে আমূল সংস্কার বা পুনর্গঠন না করিলে বর্ত্তমান যুগে এই প্রাচীন সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব এবং তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে সমাজবৈপ্লবিক মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে এমন একদল নেতা ও কর্ম্মীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা এই সমাজবৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে এবং তাহারই ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠন করিতে পারে। কোথায় সেই নেতা ও কর্ম্মীর দল? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহাদিগকেই আজ পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

উপসংহার

বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে আজ কি ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত, এই প্রবন্ধাবলীতে আমরা যথাসাধ্য সুস্পষ্টভাবে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে,—কি উচ্চস্তরে কি নিম্নস্তরে সর্ব্বত্রই এই ক্ষয়ের লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইতেছি। একদিকে মধ্যবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, অন্য দিকে হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য ও সঙ্ঘশক্তিহীনতা—বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনীশক্তিকে ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে,। তাহার উপর আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা—বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক করিয়া তুলিয়াছে। যদি এখনও বাঙ্গালী হিন্দু সচেতন হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে, হয়, তাহারা লুপ্ত হইবে, নতুবা শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতিভ্রষ্ট দাসজাতিরূপে কোনরূপে টিকিয়া থাকিবে এবং তাহা মৃত্যুরই তুল্য। এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালী হিন্দু যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

বাঙ্গালী হিন্দুই গত শতাব্দীতে জাতীয় আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, কংগ্রেসের সৃষ্টি করিয়াছিল, সমগ্র ভারতীয় জাতির প্রাণে স্বাধীনতার প্রেরণা দিয়াছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারে তাহারাই অগ্রণী হইয়াছিল, এমন এক সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহার তুলনা কেবল ভারতে নহে, সমগ্র এশিয়াতেও নাই। জীবনের সর্ব্ববিভাগে এমন সব প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের জন্ম দিয়াছিল, যাহারা

সমগ্র ভারতের গৌরব, এমন কি অনেকস্থলে বিশ্বেরও গৌরব। সেই বাঙ্গালী হিন্দুর আজ কি শোচনীয় দুর্গতি! সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিতে তাহার প্রতিষ্ঠা নাই, জ্ঞানবিজ্ঞানেও তাহার বুদ্ধি যেন ম্লান হইয়া পড়িয়াছে,—সর্ব্বভারতীয় কোন ব্যাপারে নেতৃত্ব করিবার জন্য আজ আর তাহার ডাক পড়ে না। ইহাতেও যদি বাঙ্গালী হিন্দুর চৈতন্য না হয়, তবে আর কিসে হইবে?

বাঙ্গলার হিন্দু যুবকদিগকে, শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মীদিগকে আমরা বলি,—সর্ব্বভারতীয় সমস্যা ও জাতীয় আন্দোলন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সেই দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না করিয়া একবার নিজেদের ঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরান,—কিরূপে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করুন। সকল বিষয়েই ভারতের অন্য প্রদেশের নেতাদের মুখের দিকে অসহায় ভাবে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, কেননা, বাঙ্গালী হিন্দুর সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় তাঁহাদের নাই। নিজেদের সমস্যা সমাধানের ভার নিজেদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু যদি নিজেরাই না বাঁচিল, তবে সর্ব্বভারতীয় সমস্যা বা জাতীয় জীবনের বড় বড় সমস্যার জন্য ব্যাকুল হইয়া ফল কি? আর যাঁহারা মনে করেন যে, এরূপ করিলে জাতীয়তাকে ত্যাগ করিয়া সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, তাঁহাদিগকে বলি, আত্মরক্ষা কি সাম্প্রদায়িকতা? সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে যাহারা নিজেদের জীবন-মরণ সমস্যা চিন্তা করিতে ভয় পায়, তাহাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন, তাহারা আত্মঘাতী।

বাঙ্গালী হিন্দুর এই জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে রক্ষণশীল সনাতনপন্থী সমাজপতিদের নিকট আমাদের বিশেষ নিবেদন, তাঁহারা 'আর্য্যামি'

ও সনাতনী গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া—বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই গ্রন্থে যেসব তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন,—বাঙ্গালী হিন্দু কিরূপ দ্রুত-গতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই ধ্বংস নিবারণ করিতে হইলে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আমূল সমাজসংস্কার করিতে হইবে, হিন্দুসমাজের সংহতিশক্তি যাহাতে বাড়ে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। অতীতে হিন্দুসমাজের সম্মুখে বহুবার এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীনেরা যুগোপযোগী সংস্কার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা হিন্দুর বুদ্ধি ও প্রতিভা কি এতই বন্ধ্যা হইয়াছে যে, তাহারা যুগোপযোগী সমাজসংস্কার করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না?

সর্ব্বাগ্রে হিন্দুসমাজের নিম্নজাতিদের ক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের প্রতি যে নিপীড়ননীতি আমরা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিয়া উহাদিগকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দিতে হইবে। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, জাতিভেদের কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা নিবারণ এবং অসবর্ণ বিবাহ—হিন্দু সমাজের সংহতিশক্তি গঠনের পক্ষে এই তিনটী পন্থাই অপরিহার্য্য। উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, হিন্দুসমাজে তাঁহারা সংখ্যাল্প, শতকরা ৩০ জনের বেশী নহে। অবশিষ্ট শতকরা ৭০ জনই তথাকথিত নিম্নজাতির হিন্দু। সেই নিম্ন-জাতির হিন্দুদিগকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহারা যদি কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের পার্শ্বে না দাঁড়ায়, তবে হিন্দুসমাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। ব্রিটিশ শাসকেরা হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ ভেদের সুযোগ লইয়া একটা কৃত্রিম 'তপসীলী জাতির' সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি উচ্চজাতিরা এখনও সনাতনী গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য ত্যাগ না করেন, তবে হিন্দুসমাজ

অদূর ভবিষ্যতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এই বিংশ শতাব্দীতে যে সব শিক্ষিত হিন্দু সনাতনী আর্য্য সাজিয়া প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীর বা নৈমিষ্যারণ্যের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদিগকে সূক্ষ্ম ভণ্ডামি ও ভাববিলাস ত্যাগ করিয়া আমরা আত্মস্থ হইতে অনুরোধ করি। বৈদিক যুগ বা বৌদ্ধ যুগের জয়গান করিয়া আমরা বিংশ শতাব্দীর এই কঠোর জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না।

সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে, হিন্দুনারীদিগকে যদি "আমরা সমাজে যোগ্য স্থান" না দেই, তাহাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা ও অধিকার স্বীকার না করি, তবে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি, হিন্দুসমাজের ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বিধবাবিবাহ নিষেধ। নারীদের প্রতি আমরা যে ঘোর অবিচার করিয়া আসিতেছি, তাহার প্রতিকার করিবার একটা প্রাথমিক উপায় বিধবাবিবাহের সুপ্রচলন। অন্য নানাদিক দিয়া হিন্দুসমাজে বিবাহসমস্যার যে অনাবশ্যক ও অর্থহীন জটিলতা গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, জাতিক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে তাহাও দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

বাঙ্গলার ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতিকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব আজ আমাদের মাথার উপর পড়িয়াছে। যদি এই দায়িত্ব আমরা পালন করিতে না পারি, তবে ইতিহাসে চিরদিনের জন্য আমাদের নাম কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

পরিশিষ্ট

ডাঃ মুঞ্জে ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের দুর্গতি

১৯২৩ সালে অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্ব্বে মালাবারে যে নৃশংস কাণ্ড ঘটে, তাহা সাধারণত "মোপলা বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। মালাবারের মুসলমানদিগকে 'মোপলা' বলে। মালাবারের এই মোপলারা ১৯২১ সালে স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল—মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংসার' বাণীও তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের অবসানে সহসা মোপলাদের মধ্যে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে মালাবারে হিন্দুদের সঙ্গে মোপলাদের প্রবল সঙ্ঘর্ষ হয়। মোপলারা জোর করিয়া ৩।৪ হাজার হিন্দুকে 'মুসলমান' করিয়া ফেলে, বহু হিন্দু নারী মোপলাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়, বহু হিন্দুমন্দির কলুষিত হয়। মালাবারে হিন্দুরাই সংখ্যাধিক, তৎসত্ত্বেও তাহারা এইরূপে মোপলাদের হাতে সর্ব্বপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হয়।

'মোপলা বিদ্রোহের' এই শোচনীয় কাহিনী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং হিন্দুদের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রবল চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে শৃঙ্গেরী মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য মধ্যপ্রদেশের প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতা ডাঃ বি এস মুঞ্জেকে প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মালাবারে যাইতে অনুরোধ করেন। ডাঃ মুঞ্জে মালাবারে গিয়া সমস্ত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের নিকট একটি রিপোর্ট

দেন। ডাঃ মুঞ্জের এই রিপোর্ট বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া পুণার "মারাঠা" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত কেটকারের সৌজন্যে উহার একখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ রিপোর্টে ডাঃ মুঞ্জে মালাবারের হিন্দুদের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজের দুর্গতির যে সব কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই ১৭ বৎসর পরেও তাহার সত্যতা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। ভারতের সমস্ত প্রদেশের হিন্দুদেরই ডাঃ মুঞ্জের এই মূল্যবান রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হওয়া এবং উহা লইয়া আলোচনা করা উচিত। কেননা উহার ফলে হিন্দুসমাজের ব্যাধির মূল কোথায়, তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইবে এবং প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করাও সম্ভবপর হইবে।

মালাবারের হিন্দুদের শোচনীয় এবং অসহায় অবস্থার জন্য ডাঃ মুঞ্জে ব্রাহ্মণদিগকেই দায়ী করিয়াছেন, কেননা প্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণেরাই হিন্দু সমাজ শাসন করিতেছেন এবং এ যুগেও তাঁহাদের প্রভাব অসীম। তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত নানা সামাজিক অনুশাসন, বিধিনিষেধ, আচার-ব্যবহারের কুফল ভারতের অন্যত্র যেমন, মালাবারেও তেমনি হিন্দুরা ভোগ করিতেছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ মুঞ্জে নিজে উচ্চশ্রেণীর মারাঠা ব্রাহ্মণ। ডাঃ মুঞ্জে তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন :—

"মালাবারের ব্রাহ্মণদের নিজেদের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে এমনই অদ্ভুত ধারণা যে, কোন অ-বর্ণ বা নিম্নজাতীয় হিন্দু তাঁহাদের নিকটে অন্ততপক্ষে ৫০।৬০ ফিটের মধ্যে আসিতে পারে না। এই কুপ্রথার মধ্যে শোচনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐ সব অ-বর্ণ হিন্দুরা যতক্ষণ হিন্দু থাকে, ততক্ষণই তাহাদের ঐ নিয়ম পালন করিতে হয়,—কিন্তু যেই তাহারা মুসলমান হইয়া 'খাঁ', 'সৈয়দ' প্রভৃতি পদবী গ্রহণ করে, অমনি তাহারা

স্পৃশ্য ও আচরণীয় হইয়া উঠে, ব্রাহ্মণেরা আর তাহাদের সান্নিধ্য অপবিত্র মনে করেন না। আর ঐ সব নবদীক্ষিত মোপলা—যাহারা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই হিন্দুরূপে অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য ছিল—তাহারাই উচ্চ জাতীয় হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করিতে কুণ্ঠিত হয় না। হিন্দুসমাজের এই অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা সম্বন্ধীয় বিধিবিধান 'থিয়া', 'পঞ্চমা' প্রভৃতি অ-বর্ণ হিন্দুদের চিন্তা ও চরিত্রের উপর ঘোর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মালাবারের হিন্দুসমাজে ইহারাই সংখ্যাধিক এবং ইহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহ, দৈহিক শক্তিশালী। বিপদের সময়ে মোপলাদের আক্রমণ হইতে অন্যান্য হিন্দুদিগকে ইহারাই রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সামাজিক পাপের ফলে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা ইহাদের সহানুভূতি হারাইয়াছে। যদি ইহাদিগকে হিন্দুসমাজের মধ্যে সম্মানের স্থান দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তবেই কেবল হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।"

ডাঃ মুঞ্জে মালাবারের হিন্দুসমাজের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, বাঙলার হিন্দু সমাজের সম্বন্ধেও ঠিক সেই মন্তব্য করা যাইতে পারে। এখানেও "অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়" হিন্দুদিগকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ঐ সব 'অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়' হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খৃষ্টান হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা তাহাদিগকে ভয় ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। "অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়" অর্থাৎ নিম্নজাতীয় হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের এই ব্যবহারের ফলে হিন্দু সমাজ বহুধাখণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে,—নিম্নজাতীয় হিন্দুরা নিজেদের আর 'হিন্দু' বলিয়া গর্ব্ববোধ করিতে পারে না।

মালাবারের অধিকাংশ মোপলাই হিন্দুদের বংশধর। কিরূপে মালাবারের মোপলাদের সংখ্যা এরূপ বাড়িয়া গেল, তাহাদের এতটা

প্রাধান্যই বা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া ডাঃ মুঞ্জে বলিতেছেন :—

"প্রচলিত কাহিনী এই যে, ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে মালাবারের হিন্দু রাজা ব্রাহ্মণদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় নিজের রাজ্যমধ্যে বসতি স্থাপন করিবার জন্য আরব মুসলমানদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা প্রদান করেন। রাজা এই সব আরবকে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য অনুমতি তো দিলেন-ই, তাহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্যদানকল্পে এমন আদেশও জারী করিলেন যে, প্রত্যেক হিন্দু ধীবর পরিবারের অন্তত একজন পুরুষকে মুসলমান হইতে হইবে। এইরূপে একদিকে রাজার প্রশ্রয় ও সাহায্য, অন্যদিকে মুসলমানদের উৎসাহ, জবরদস্তি এবং প্রলোভনের ফলে দলে দলে হিন্দুরা মুসলমান হইতে লাগিল, হিন্দুরা জীবনসংগ্রামে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। আর জামোরিণ রাজাদের তথা হিন্দুসমাজের গুরু ও পরামর্শদাতা ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন ঔদাসিন্যের সহিত সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, 'অস্পৃশ্য' হিন্দু তথা মুসলমান সম্প্রদায় উভয়ের আক্রমণ হইতেই তাঁহাদের পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম নিরাপদ রহিল। ব্রাহ্মণেরা সমুদ্রযাত্রার যে নিষেধবিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ সমস্ত তাহারই প্রত্যক্ষ পরিণাম। মালাবার সমুদ্রকূলবর্ত্তী রাজ্য—উহা রক্ষা করিবার জন্য নৌবহর ও নৌসৈন্য চাই। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া হিন্দুরা ঐ সব কাজ করিতে পারে না। কাজেই রাজাকে উহার জন্য আরব মুসলমান ও উহাদের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু বংশধরদের উপরই নির্ভর করিতে হইল।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত একটা অস্বাভাবিক সামাজিক নিষেধবিধির জন্য মালাবারের হিন্দু রাজার নির্দ্দেশে হিন্দুসমাজ আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত

আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত বিরল। বাঙলার হিন্দুসমাজেও সমুদ্রযাত্রা নিষেধবিধি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কি ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণই ইহাই। এরূপ আত্মহত্যাকর সামাজিক বিধান হিন্দুসমাজে আরও বহু আছে।

সাধারণভাবে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের দুর্গতির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া ডাঃ মুঞ্জে বলিয়াছেন যে, হিন্দু সমাজের গঠন ব্যবস্থাই তাহার দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। হিন্দু সমাজ নানা জাতি ও নানাস্তরে বিভক্ত। ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের সংস্কৃতি, শিক্ষা, আচারব্যবহার স্বতন্ত্র, এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের প্রাণের যোগ নাই। পরস্পরের প্রতি সমবেদনা নাই। সুতরাং এই সমাজে সংহতিশক্তি আসিবে কোথা হইতে? ইহার এক অংশ আক্রান্ত হইলে, অন্য অংশ যে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যতদিন হিন্দুরা স্বাধীন ছিল, ততদিন এই জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ বিশেষ কোন বাধা পায় নাই। উচ্চজাতিরা নিম্নজাতিদের অবজ্ঞা করিত, তাহাদের পায়ের তলায় রাখিত, আর নিম্নজাতিরাও সেই দাসত্বকে অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া নিরুপায়ভাবে মানিয়া লইত। কিন্তু যখন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীরা বিজয়ীবেশে এদেশে আসিল এবং প্রভু হইয়া বসিল, তখন হইতে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। প্রথমে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী পাঠান ও মোগলেরা, তারপর খৃষ্টান ইউরোপীয়েরা। ইহাদের কাহারও মধ্যে জাতিভেদ নাই,—ইহাদের সামাজিক ব্যবস্থায় সকলেই সমান, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিচার তো নাই-ই। নিম্নজাতিরা সহজেই এই তথ্য আবিষ্কার করিল এবং বিদেশী প্রভুদের আশ্রয় ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে বিলম্ব করিল না। বিদেশী প্রভুরাও তাহাদিগকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে লাগিল। যাহারা এতকাল স্বীয় সমাজের উচ্চশ্রেণীর নিকট অবজ্ঞা ও

অপমান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা বিদেশী প্রভুদের নিকট ভিন্নরূপ ব্যবহার পাইয়া, স্বভাবতঃই তাহাদের অনুগত হইয়া পড়িল। ইহার ফলে হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণীয় ও নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া গেল,—উচ্চবর্ণীয়দের প্রতি নিম্নবর্ণীয়দের যেটুকু সহানুভূতি ও মমত্বের ভাব ছিল, তাহাও হ্রাস পাইতে লাগিল। তারপর নিম্নবর্ণীয়েরা যখন দেখিল যে, ঐসব বিদেশী প্রভুদের নিকট উচ্চবর্ণীয়েরাও মাথা নত করিতে লাগিল, তাহাদের চাকুরী গ্রহণ করিল, তখন স্বভাবতঃই উচ্চবর্ণীয়দের প্রতি নিম্নবর্ণীয়দের শ্রদ্ধাও ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণেরা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়াও দেখিলেন না, ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষার তথা সমাজরক্ষার কোন ব্যবস্থা করিলেন না। ফলে আজ নিম্নজাতীয়েরা হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে। বিদেশী শাসকেরা একটা কৃত্রিম 'তপসীলী' সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া সেই বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্যকে পাকা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ডাঃ মুঞ্জে মালাবারে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা স্বভাবতই শান্ত, নিরীহ এবং 'বশম্বদ' প্রকৃতির; তাহারা দুর্দ্দান্ত এবং বেপরোয়া প্রকৃতির মুসলমান প্রতিবাসীদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, সহজেই নতি স্বীকার করে। হিন্দুদের এই প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্যের কারণ কি, ডাঃ মুঞ্জে তাহার বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে, ডাঃ মুঞ্জে মালাবারের হিন্দুদের চরিত্রে যে সব ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা ভারতের সকল প্রদেশের হিন্দুদের চরিত্রেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ডাঃ মুঞ্জের এই বিশ্লেষণ সকল প্রদেশের হিন্দুদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ডাঃ মুঞ্জেও সেই দিক হইতেই ইহার বিচার করিয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জের মতে হিন্দু সমাজের এই প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্যের কারণ—(১) হিন্দুরা সাধারণত

নিরামিষাশী, নিরামিষ খাদ্য মানুষকে শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ করিয়া তোলে। (২) বৈদিক আদর্শ ছিল জীবনকে বীর্য্যবানের মত ভোগ করা। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভৃতির আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল বৈরাগ্য ও ত্যাগ। এই আদর্শ হিন্দুদের ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে। (৩) 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'—এই অ-বৈদিক আদর্শ হিন্দু সমাজের সবল মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। (৪) বাল্যবিবাহও হিন্দুদের শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। এমন কি, ডাঃ মুঞ্জের মতে বাল্যবিবাহ ও নিরামিষ আহার—এই দুইয়ে মিলিয়া হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

হিন্দুসমাজের সংহতিশক্তির অভাবের জন্য জাতিভেদই যে প্রধানত দায়ী, একথা ডাঃ মুঞ্জে পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি সরাসরি জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন নাই। জাতিভেদের কুফলকে কিরূপে প্রতিহত করিয়া হিন্দুসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংহতিসম্পন্ন করা যায়, তাহারই উপায় চিন্তা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ডাঃ মুঞ্জের সিদ্ধান্ত এই :—

(১) হিন্দুদের এমন একটা স্থান থাকা চাই যেখানে সমস্ত জাতি ও বর্ণের হিন্দু একত্র মিলিত হইতে পারে। মুসলমানদের মসজিদ এইরূপ স্থান। এখানে উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র ভেদ নাই, সকলে মিলিত হইয়া সামাজিক কল্যাণ ও সুখদুঃখের কথা আলোচনা করে। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা-কণ্টকিত হিন্দুদের মধ্যে ঐরূপ সাধারণ মিলনভূমি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এখন হিন্দুসমাজের কল্যাণের জন্য দেবমন্দিরকে ঐরূপ মিলনক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে। এখানে উচ্চনীচভেদ থাকিবে না, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে। ডাঃ মুঞ্জে বলেন, ইহা একটা অসম্ভব প্রস্তাব নয়, পুরীর জগন্নাথ মন্দির এখনও সর্ব্বজাতীয়

হিন্দুর মিলনক্ষেত্র। জগন্নাথ মন্দিরের দৃষ্টান্ত সমস্ত গ্রামে নগরে অনুসরণ করিতে হইবে। ইহার ফলে হিন্দুসমাজের সংহতি শক্তি বাড়িবে।

(২) অসবর্ণ বিবাহ প্রথার বহুল প্রচলন করিতে হইবে। এই প্রথা বর্ত্তমানে অপ্রচলিত হইলেও মোটেই অ-শাস্ত্রীয় নহে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ব্যবস্থা মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকার সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে যে ইহা প্রচলিত ছিল, তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ডাঃ মুঞ্জে মনে করেন যে, অসবর্ণ বিবাহ বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইলে, জাতিভেদের তীব্রতা হ্রাস হইবে, হিন্দুসমাজের সংহতি শক্তিও বাড়িবে। অসবর্ণ বিবাহের সুফলের উপর ডাঃ মুঞ্জের এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার মতে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে হিন্দুসমাজের সমস্ত ব্যাধি দূর হইবে। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়াছেন—

I believe that it is the reversion to this "Dharmasastric" sociology which will prove a panacea for all the social evils that beset the present Hindu Society.

(৩) অস্পৃশ্যতা ও অনাচারনীয়তা বর্জ্জন। ডাঃ মুঞ্জে বলেন,—"হিন্দুসমাজের পক্ষে ইহাই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, কেননা ইহা ব্যতীত হিন্দুরা তাহাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে না এবং জীবনসংগ্রামে বিদেশী ও বিধর্ম্মীদের দ্বারা পদে পদে প্রতিহত হইবে।" সর্ব্বাগ্রে তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনাচরনীয়দের মন্দির প্রবেশের অধিকার এবং অন্য সকলের সঙ্গে মিশিয়া দেবতার পূজা করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তারপর তাহাদিগকে অন্য সমস্ত সামাজিক অধিকার দিতে হইবে। অস্পৃশ্য, অনাচরনীয় ও অবনতরূপে যাহাদিগকে আমরা পৃথক করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগকে যদি আপনার করিয়া লইতে না পারি, তবে হিন্দুসমাজের ও হিন্দুজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

উপসংহারে ডাঃ মুঞ্জে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সমস্যাকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) জাতিভেদ প্রপীড়িত হিন্দুসমাজকে কিরূপে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংহতিশক্তিসম্পন্ন করিতে হইবে; (২) "নিরীহ ও শান্ত" হিন্দুকে কিরূপে সবল মনোবৃত্তিসম্পন্ন ও আত্মরক্ষায় সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ মুঞ্জে হিন্দুসমাজের সম্মুখে যে সমস্যা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, এখনও আমরা তাহার সমাধান করিতে পারি নাই। অদূর ভবিষ্যতে যদি না করিতে পারি, তবে হিন্দুসমাজের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব।

মানব সভ্যতায় 'অহিংসার স্থান'

মহাত্মা গান্ধী কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রত্যেক ব্রিটেনের প্রতি" এই শিরোনামা দিয়া যে পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মানবসভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পত্রখানি তিনি ভারতের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধির মারফৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার একটা উত্তরও বড়লাটের মারফৎ গান্ধীজীকে দিয়াছেন। তাঁহারা সৌজন্যসহকারে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় মহাত্মাজীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে তাঁহারা অক্ষম।

সমগ্র ইউরোপ যখন নাজীবাহিনীর পদভরে টলমল, সমুদ্র পরিখাবেষ্টিত ব্রিটেন হিটলারের বিমানবাহিনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পন্থা উদ্ভাবনে ব্যাপৃত, তখন ব্রিটিশ জাতির নিকট অস্ত্র ত্যাগের জন্য প্রস্তাব করা বর্ত্তমান জগতে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব। অন্য কেহ এরূপ প্রস্তাবের কথা কল্পনাই করিতে পারিত না। কল্পনা করিতে

পারিলেও, তাহা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে সাহস পাইত না, অন্ততপক্ষে দ্বিধাবোধ করিত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সাধারণ মানব নহেন, অসাধারণ মানব। অসাধারণ মানবেরাই অসাধারণ প্রস্তাব করিতে পারেন। অনুরূপ অবস্থায় বুদ্ধ, খৃষ্ট বা চৈতন্যও খুব সম্ভব ঐরূপ প্রস্তাবই করিতেন। পক্ষান্তরে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে জবাব দিয়াছেন, কোন সাধারণ মানুষ, রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্টেও উহা ব্যতীত অন্য কোনরূপ উত্তর দিতে পারিতেন না।

মহাত্মা গান্ধী কেবল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটই এইরূপ প্রস্তাব করেন নাই, ভারতের গণশক্তির প্রতিনিধি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নিকটও অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু যে কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ কারণেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মাজী চীন, আবিসিনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, প্রভৃতিকেও ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারও উহা গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই।

মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবটি বড়লোকের খেয়াল বা পাগলামী বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বস্তুত, মহাত্মাজী তাঁহার প্রস্তাবের মধ্য দিয়া যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা মানবসভ্যতার একটা জটিল প্রশ্ন, উহার উপর মানবসভ্যতা তথা মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট ও চৈতন্যও এই প্রশ্নই তুলিয়া মানবসভ্যতাকে ঢালিয়া সাজিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সফলকাম হন নাই, মহাত্মাজীও সফলকাম হইবেন না। তথাপি প্রশ্নটি রহিয়া যাইবে এবং অনাগত ভবিষ্যতে অন্য কোন মহাপুরুষ আসিয়া উহার সমাধানের জন্য পুনরায় চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্নটি এই,—মানুষ কি "হিংসা" ত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণভাবে 'অহিংসার' আদর্শের দ্বারাই জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবে? লোকরক্ষা, সমাজস্থিতি, বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা—সমস্তই কি

অহিংসা ও মৈত্রীর দ্বারা সাধন করা সম্ভবপর? মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন, তাহা সম্ভবপর। সমাজস্থিতি রক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা,—সমস্তই অহিংস উপায়ে করা যাইতে পারে এবং সভ্য মানুষকে তাহাই করিতে হইবে। পরাধীন দেশের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামও তিনি এই অহিংস উপায়ে চালাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন, হিংসা ও বলপ্রয়োগ মানুষের পশুত্ব ও বর্ব্বরতার নিদর্শন। আদিম বর্ব্বর মানুষের পক্ষে এই পন্থা অবলম্বন স্বাভাবিক হইতে পারে। কিন্তু মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিয়াছে, ততই সে অধিক পরিমাণে অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। পৃথিবীতে যে সব প্রধান প্রধান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলিও অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শেই অনুপ্রাণিত। আদিম বন্য বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ গায়ের জোর ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মিটাইতে জানিত না। কিন্তু মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি যতই উন্নত হইয়াছে, ততই সে গায়ের জোরের পরিবর্ত্তে বুদ্ধি ও চরিত্রবলের আশ্রয় লইয়াছে; প্রেম ও অহিংসাকেই উচ্চতম নীতি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। নরমাংস ভক্ষণ, নিহত শত্রুর মাথার খুলি লইয়া গলায় মুণ্ডমালা ধারণ, শত্রুর রক্তপান প্রভৃতি আদিম যুগের প্রথা—সভ্য মনুষ্যসমাজে লোপ পাইয়াছে। মানুষ পরিবার ও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অথচ আদিম বর্ব্বর যুগের নিদর্শন যুদ্ধটাই শুধু টিকিয়া থাকিবে কেন? সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাও বিলুপ্ত হওয়া উচিত। নতুবা আদিম বন্য মানুষ ও সভ্য মানুষে প্রভেদ রহিল কি?

যুক্তির দিক দিয়া কথাগুলি আপাতত নির্ভুল বলিয়াই মনে হয় বটে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে একটা ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, objective reality বা

বাস্তব সত্যের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য সাধন করা যায় না। মানবসভ্যতার একটা বড় ট্রাজেডি এই যে, মানুষ বুদ্ধি ও মেধার দিক দিয়া যেরূপ উন্নত হইয়াছে, ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া তদনুপাতে উন্নত হয় নাই, বরং অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস লেখক জনৈক মনীষী এজন্য দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মানুষের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের মানবের বুদ্ধি ও মেধা তীক্ষ্নতর হইয়াছে, জ্ঞানবিজ্ঞানে সে উন্নত হইয়াছে, প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিয়া নানা অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রের সে আবিষ্কার করিয়াছে; কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া, প্রেম ও অহিংসার মাপকাঠিতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মনুষ্য সমাজের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের মানুষের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। মানুষ ঠিক সেইরূপ নিষ্ঠুর, হিংস্র, ঈর্ষাপরায়ণ, পরধনলোভী, দুর্ব্বলপীড়কই আছে। তারপর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যে মানুষ যেটুকু-বা সত্য, অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতির নীতি রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে সেটুকুও করে না। এখানে মানুষ একেবারে আদিম যুগের বন্য, বর্ব্বর, হিংস্র। বরং আদিম যুগের মানুষের তুলনায় বুদ্ধি ও মেধায় উন্নত হওয়াতে তাহার ক্রূরতা ও হিংস্রতা আরও বেশী ভয়ঙ্কর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে সে প্রতিবেশীর সংহার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে, প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুর হইতে যে সব অত্যাশ্চর্য্য রহস্যের সে সন্ধান পাইয়াছে, তাহার দ্বারা শক্তিশালী মারণাস্ত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিতেছে। অর্থাৎ তথাকথিত সভ্য, উন্নত মানুষের বুদ্ধি সর্ব্বনাশী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। ছিন্নমস্তার ন্যায় সে নিজের রুধির নিজেই পান করিয়া পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বুদ্ধির দ্বারা শাণিত এই প্রতিযোগিতামূলক হিংসার খেলায়, অথবা বৈজ্ঞানিক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে যদি মহাত্মা গান্ধীর মত দুই একজন আদর্শবাদী মহাপুরুষ অহিংসা ও

প্রেমের জয়গান করেন, তবে কে তাঁহাদের কথা শুনিবে? অহিংসা ও প্রেমের আদর্শের প্রতি যদি কোন মানুষের, সমাজের বা রাষ্ট্রের শ্রদ্ধা থাকিয়াই থাকে, তাহা হইলেও উহার দ্বারা কিরূপে সে আত্মরক্ষা করিবে? একজন বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য বা মহাত্মা গান্ধী প্রেম ও অহিংসার আদর্শের জন্য পশুবলের নিকট আত্মবলি দিতে পারেন, কিন্তু একটা জাতি বা রাষ্ট্র কিরূপে তাহা করিতে পারে? মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবমত যদি কোন জাতি বা রাষ্ট্র হিংসার ভাব সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া, অস্ত্রত্যাগ করিয়া আততায়ীর নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে হয় সেই জাতি বা রাষ্ট্র আততায়ী কর্তৃক সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে, অথবা দাসজাতি বা দাসরাষ্ট্রে পরিণত হইবে। অহিংসার জন্য এই আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনাসক্ত মহাত্মা গান্ধী পুলকিত হইতে পারেন, কিন্তু কোন জাতি বা রাষ্ট্রই ঐভাবে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া প্রেম ও অহিংসার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সম্মত হইতে পারে না। সেই কারণেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁহার প্রস্তাবে সায় দেন নাই। কেবল আততায়ী জাতি বা রাষ্ট্রের সম্পর্কেই নয়, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। অহিংসা ও প্রেমের আদর্শ রক্ষার জন্য কোন রাষ্ট্রই চোর, ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, বিদ্রোহী বা ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে না।

মোট কথা, যতদিন পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র অহিংস না হইয়া উঠিতেছে, ততদিন মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য হিংসা ও বলপ্রয়োগের পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ, বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করা যায়, ইহা বাস্তব জগতের পরীক্ষিত সত্য। প্রেম ও অহিংসার দ্বারা হিংসা ও পশুবলের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর,

এই সত্য সর্ব্বক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যাইতে পারে বটে, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ২।৪ জন মহাপুরুষের জীবনেও এই সত্য পরীক্ষিত হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে, মনুষ্যসমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে এখনও উহা সত্য হইয়া উঠে নাই,—কোনকালে হইবে, এরূপ সম্ভাবনাও আমরা দেখি না।

অন্যায়কারী, অত্যাচারী বা আততায়ীকে কি উপায়ে প্রেম ও অহিংসার দ্বারা জয় করা সম্ভবপর, মহাত্মা গান্ধী বহুবার তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষের মনেই দেবভাব নিহিত আছে। ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারা যদি অত্যাচারী বা আততায়ীর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সেই দেবভাবের উদ্বোধন করা যায়, তাহা হইলেই অহিংসপন্থীর উদ্দেশ্য সফল হইবে, অত্যাচারী বা আততায়ী প্রেমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নত হইবে বা অস্ত্রত্যাগ করিবে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দেবভাবের উপর মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় এইরূপ একান্ত বিশ্বাস সাধারণ মানুষের নাই। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এরূপ অহিংসার পরীক্ষা হয়ত সফল হইতে পারে, কিন্তু কোন সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতিই এইরূপ একটা 'থিওরি' বা মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রেম, ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারা আবিসিনিয়েরা আততায়ী ইতালীর হৃদয় জয় করিতে পারিত না, কিম্বা চেকোশ্লোভাকিয়া বা পোল্যাণ্ড সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও হিটলার ও তাঁহার নাজীবাহিনীর অন্তরের "দেবভাব" জাগাইয়া তুলিতে পারিত না।

আমরা এতক্ষণ প্রধানত মহাত্মা গান্ধীর যুক্তি অনুসরণ করিয়া মানবসভ্যতায় অহিংসার স্থান ও উহার কার্য্যকারিতার সীমা নির্ণয়ের

চেষ্টা করিলাম। এইবার আর একটু অগ্রসর হইয়া আমরা বলিব—বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য বা মহাত্মা গান্ধীর এই 'অহিংসা দর্শন' মানবজীবনের পূর্ণ সত্য ব্যক্ত করে না, মানবসভ্যতা এই "নিভাঁজ" অহিংসনীতির উপরে গড়িয়া উঠিতে পারে না, কোন যুগে গড়িয়া উঠেও নাই এবং যেখানেই এই চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যে 'হিংসার' একটা স্থান আছে এবং উহাকে বাদ দিয়া মানুষের জীবনযাত্রা চলিতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম হইতে অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষের পক্ষেও "হিংসা" আত্মরক্ষার প্রধান উপায়, ইহাকে বর্জ্জন করিলে বহুযুগ পূর্ব্বেই মনুষ্যজাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইত। প্রেম, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি যেমন মানবপ্রকৃতির অংশ,—কাম, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতিও তেমনি উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের বংশবিস্তার ও আত্মরক্ষার জন্য ঐ প্রবৃত্তিগুলি অপরিহার্য্য। প্রেম, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতির তুলনায় কাম, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতিকে নিম্নতর বৃত্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোনমতেই ঐগুলিকে অনাবশ্যক বলিয়া বর্জ্জন করা বা ধ্বংস করা যায় না। তবে এই সব নিম্নতর বৃত্তির মোড় ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখী করা যাইতে পারে,—অর্থাৎ ঐগুলিকে মহত্তর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে,—যথা দেশরক্ষা, জাতিরক্ষা, মানবকল্যাণ সাধন ইত্যাদি। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকদের ভাষায় ইহারই নাম sublimation! এইরূপ "উন্নয়নের" ফলেই ক্রোধ, হিংসা, কাম প্রভৃতি শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রেম প্রভৃতিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ঐগুলি নষ্ট হয় না, 'সংশোধিত' বা উন্নত হইয়া মানবকল্যাণে সহায়তা করে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের এইসব বিভিন্ন বৃত্তির উৎকর্ষসাধন ও তাহাদের মধ্যে সুসঙ্গত সামঞ্জস্য স্থাপনই মানবসভ্যতার পূর্ণ আদর্শ। যে সমাজ বা জাতি কতকগুলি বৃত্তির উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেয় এবং অন্যগুলিকে

দমন বা অবহেলা করে, তাহাদের অধঃপতন সুনিশ্চিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক সময়ে ভারতবর্ষ অতিরিক্ত পরিমাণে অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু সেই অনুপাতে শক্তিসামর্থ্য, শৌর্য্যবীর্য্যের চর্চ্চা করে নাই। ফলে বিদেশী আততায়ী কর্ত্তৃক সে পদ্‌দলিত হইয়াছিল, আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তাহার ছিল না। অহিংসার আদর্শ ভারতবর্ষে কিরূপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং তাহার কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিব। পাঠানেরা যখন প্রথম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারত আক্রমণ করে তখন ঐ অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ঐ সব রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল ছিল, বৌদ্ধ শ্রমণেরা রাষ্ট্র ব্যাপারেও কর্ত্তৃত্ব করিতেন। পাঠানেরা নগর আক্রমণ করিলে এইসব বৌদ্ধ শ্রমণেরা বলিলেন, প্রভু বুদ্ধের রাজ্যে হিংসা চলিবে না,—অতএব দুর্গদ্বার খুলিয়া দাও, অস্ত্র ত্যাগ কর, আততায়ীদের আসিতে দাও। ফল কি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐ সব রাজ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাত্মা গান্ধীও আজ সেই বৌদ্ধ শ্রমণদের মতই আততায়ীর সম্মুখে অস্ত্রত্যাগ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত,—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের জৈনদের মধ্যে অহিংসা এরূপ বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছিল যে, তাহারা দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রমণ, লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতিতেও বাধা দিত না। ফলে সর্ব্বত্র অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে কোন সমাজ বা জাতি যদি প্রেম, অহিংসা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র হিংসা ও শক্তিচর্চ্চার উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেয়, তবে সেই সমাজ বা জাতি প্রকৃতপক্ষে আদিম বন্য বর্ব্বর সমাজ হইয়া দাঁড়ায়,—যুদ্ধ, নরহত্যা, পররাজ্য জয়, দস্যুতা, লুণ্ঠন—এই

সবই তাহাদের নিত্যকার্য্য হইয়া উঠে। এইরূপ জাতি বা সমাজের দ্বারা পৃথিবীর ঘোর অকল্যাণ হয়, তাহাদের আদর্শ মানব সভ্যতার উচ্চাদর্শ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না।

বস্তুত হিংসা ও অহিংসার সুসঙ্গত সামঞ্জস্য সাধনেই মানব সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ। এই আদর্শে অহিংসা ও মৈত্রীর যেমন স্থান আছে, আত্মরক্ষার্থ অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার জন্য হিংসারও তেমনি স্থান আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় এই পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন। সর্ব্বকালের মানবজাতির জন্য তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, মাত্র প্রেম ও অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে, যুদ্ধমাত্রই পাপ নহে;—ধর্ম্মরক্ষার জন্য, দেশরক্ষার জন্য, লোককল্যাণের জন্য যুদ্ধও অবশ্য কর্ত্তব্য। সেক্ষেত্রে অনাসক্তভাবে কর্ম্মযোগীর মত হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অহিংসা ও প্রেমের নামে যিনি মনুষ্যসমাজ বা মনুষ্যজাতিকে অন্যায়ের নিকট আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিবেন, তিনি মানুষকে বিপথগামীই করিবেন। বৌদ্ধ অহিংসার ফলে ভারতবর্ষ যখন নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন গীতোক্ত এই মহৎ মানব ধর্ম্ম ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। উহার ফলে ভারতে আবার হিন্দুজাতির নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল।

বীর্য্যহীন যে অহিংসা, তাহা তামসিক অহিংসা। উহারই আর এক নাম 'ক্লৈব্য'। তার চেয়ে সাত্ত্বিক হিংসা শ্রেষ্ঠ। আমাদের আশঙ্কা হয়, মহাত্মা গান্ধী আজ সেই তামসিক অহিংসার বাণীই প্রচার করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন বটে যে, তিনি শক্তিমানের অহিংসার আদর্শ প্রচার করিতেছেন, কিন্তু আসলে তাঁহার প্রচারিত অহিংসা দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্যের তামসিক অহিংসা। কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বীর্য্যবানের অহিংসা অথবা সাত্ত্বিক হিংসার আদর্শই কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সাত্ত্বিক হিংসা

সমাজরক্ষা দেশরক্ষা লোক কল্যাণার্থ যুদ্ধ করিতে ভয় পায় না। মহাত্মা গান্ধী গীতার যে ভাষ্য করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহাতে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতার মূলতত্ত্বকে বৌদ্ধ বা জৈন অহিংসার ছাঁচে কখনও ঢালা যায় না। মহাত্মা গান্ধী সেই অসাধ্যসাধন করিতে গিয়া ব্যর্থপ্রয়াস করিয়াছেন মাত্র। মহাত্মা গান্ধী নানাদিক দিয়াই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব। কিন্তু তিনি যে নিষ্ক্রিয় তামসিক "অহিংসার" আদর্শ প্রচার করিতেছেন, তাহা কখনই মানবজাতির কল্যাণ করিতে পারিবে না। যদি মানুষ তাঁহার ঈপ্সিত পথে কখনও সম্পূর্ণরূপে "অহিংস" হইয়া উঠে, তবে তাহারা আর মানুষ থাকিবে না, দেবতা হইয়া যাইবে, অথবা ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। প্রথম কল্পনা অবাস্তব, দ্বিতীয় কল্পনা যে আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে পোষণ করিতে পারি না তাহা বলাই বাহুল্য।

সমাপ্ত